সন্ধের পরে

বুদ্ধদেব গুহ

বাটুমা গেটটা বন্ধ করে দিয়ে যাও।

গিগি বলল, চেঁচিয়ে।

গারাজ থেকে ভৃগুর ফিয়াট জোরে ব্যাক করে বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পেলেন নলিনী নিজের ঘর থেকে। এইমাত্র পুজো শেষ করলেন। সকালের দিকে সময় পান না। নাতি টুটুও একটু আগে টাটা! ঠাম্মা! বলে, গলা জড়িয়ে, চুমু দিয়ে, দৌড়ে বেরিয়ে গেছে। মা বাবা ছেলে এক সঙ্গেই বেরোয় রোজ। ছেলেকে স্কুলে নামিয়ে, গিগিকে, গিগি যে স্কুলে পড়ায় সেই স্কুলে পৌঁছে অফিসে চলে যায় ভৃগু।

টুটুকে বাটুমাই নিয়ে আসে আগে সাইকেল রিকশা করে দুপুরে। কোনো কোনোদিন নলিনী নিজেও যান। গিগি পাঁচটা নাগাদ ফেরে সাইকেল বা অটো-রিক্সাতে। ভৃগুরা ফিরতে ফিরতে সেই সাড়ে ছ'টা সাতটা। ব্যাঙ্কের নতুন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হয়েছে সে। দায়িত্ব অনেকই।

কোনো কোনোদিন বাজার-টাজার করার থাকলে এবং শুক্রবারে তো নিশ্চয়ই স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গেই ফেরে। ওর স্কুল থেকে গিগি চলে আসে ভৃগুর অফিসে। মাইলখানেক পথ। হেঁটেই যায়। গিগি বলে, সারাদিন কাজের পর একমাইল হাঁটা খুব ভাল। বেশি হাঁটতে পারলে আরো ভালো ভবে রাস্তায় যা ভীড়! হাঁটা প্রায় অসম্ভবই।

তা ঠিকই। যখন জ্যোতিষের সঙ্গে বিয়ের পর ভোপাল থেকে জব্বলপুরে প্রথম এসেছিলেন নলিনী, তখনকার জব্বলপুর কত অন্যরকম ছিল। এই তিরিশ বছরে এতোই বদলে গেছে যে, শহরটাকে চেনাই যায় না। এত লোক, এত গাড়ি, এত সাইকেল আর এত অটো-রিকশা। এত বাড়ি-ঘর। তাও সিভিল লাইনস্ আর ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার কিছু কিছু জায়গা এখনও ভাল আছে। তাঁদের পাঁচপৈঁড়ি অবশ্য বেশ 'পশ' পাড়াই। সামান্য কটি বাড়ি। নির্জন। সামনে মস্ত চওড়া রাস্তা। বড় বড় গাছ। এখানে বসে মনেই হয় না যে, জব্বলপুরে আছেন। এদিকের প্রায় বাড়িতেই বাগান। পাখি আসে নানারকম, বিভিন্ন ঋতুতে। এই নির্জনতা, গাছ-গাছালি, পাখি-পাখালি, এইটেই মস্ত সুখ। জব্বলপুর কেন, খুব কম শহরের মানুষই এখন এই সুখকে জানে। অবশ্য নলিনী এও বেশ বুঝতে পারেন যে, সব মানুষের বুকেই যেন আবার গাছের প্রতি, ফুলের প্রতি, পাখির প্রতি ভালোবাসা ফিরে আসছে। মানুষ, অনেক দেরি করে হলেও বুঝতে শুরু করেছে যে, প্রকৃতি ছাড়া মানুষের বাঁচার কোনোই উপায় নেই। গাছই মানুষের প্রাণ।

পুজো সবে শেষ হয়েছে। রোদটাও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। টাটকা আনাজ উঠতে আরম্ভ করেছে বাজারে। জব্বলপুরে এই শীতকালটাই আরামের। মাছ ; তরি-তরকারি। ভৃগু আর গিগির মেজাজও ভালো থাকে এই ক'টা মাস। নইলে অন্যসময় মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে ফেলে ওরা নলিনীকে যে মা এবং শাশুড়ী হয়েও সহ্য করা মুশকিল হয়। সেই সব সময়ে স্বামী জ্যোতিষকে খুবই মনে পড়ে। তবু, তেপান্নতে পৌঁছে নলিনী এখন জেনেছেন যে, সহ্য করারই আরেক নাম বেঁচে থাকা। সহ্য না করলে, বাঁচাই যায় না।

বিধবা হয়েছেন মাত্র পাঁচ বছর। জ্যোতিষ গানক্যারেজ ফ্যাক্টরীর বড় অফিসারই ছিলেন। এস্টেট-ডিউটির ভয়ে সিভিল-লাইনস্-এর পাচপেড়ির এই জ্যোতিষালয়' মৃত্যুর দশবছর আগেই একমাত্র সন্তান ভৃগুকে দান করে দিয়ে যান। ভেবেছিলেন, সঞ্চয় যা আছে এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং গ্র্যাচুইটি মিলিয়ে যা পাবেন তাতে বাকি জীবনটা ছেলে-বৌয়ের সঙ্গে থেকে বেশ স্বাচ্ছন্দেই কেটে যাবে। ছেলে বৌ-এর উপর কোনদিক দিয়েই নির্ভরশীল না হয়েও। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। জ্যোতিষের ক্যানসার যে হবে তা কে জানতো! চিকিৎসাতে যেটুকু সঞ্চয় ছিল, তিন বছরে তার প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে গেল। তিরিশ হাজার টাকা আছে এখন নলিনীর নামে ব্যাঙ্কের ফিক্সড-ডিপোজিটে। সে টাকার সুদ হয় বছরে তিনহাজার। মাসে আড়াইশো। তা থেকে মাসের প্রথমেই দুশো তুলে দেন বৌমা গিগির হাতে। যে ক'দিন আছেন, সংসারে এইটুকুই তাঁর অবদান। পঞ্চাশটা টাকা রাখেন পানজর্দার জন্যে। ঐ একটিই নেশা নলিনীর। নিজের নেশার খরচ ছেলে বৌ-এর কাছে হাত পেতে নিতে ইচ্ছে করে না।

ছেলে-বৌ দুজনে মিলে রোজগার অবশ্য মন্দ করে না। ভৃগু স্টেট ব্যাঙ্কে আছে। অফিসার গ্রেডে। গিগি ইংরিজি-মিডিয়াম স্কুলে পড়ায়। আজকাল জীবনযাত্রার ধারাও তো পাল্টে গেছে! বছরে ছেলে-বৌ একবার করে "হলিডে"তে যায়, একমাত্র সন্তান টুটুকে নিয়ে। বাড়িতেও পার্টি-টার্টি লেগেই থাকে। এসব নলিনীদের সময়ে একেবারেই ছিল না। ওঁরা বেড়াতে গেলে,

ইন্দোর, ভোপাল, উমেরিয়া বা ঝিলিমিলিতে যেতেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি। কৃচিৎ কদাচিৎ কলকাতাতেও। তবে, কলকাতায় যতবারই গেছেন ততবার গিয়েই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে। এত ভীড়, ধুঁয়ো, ধুলো, আওয়াজ। এখন জব্বলপুরও প্রায় সেরকমই হয়ে উঠছে। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গার আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছেন ওঁদের কাছে। ওঁদের সময়ে যেখানে আত্মীয়-স্বজন নেই সেখানে বেড়াতে গিয়ে হোটেলে থাকার কথা ওরা কখনও ভাবেনওনি। তখন আনন্দ বলতে পুজোর সময় দুর্গা বাড়ি, পুজোর পরের লাগাতার যাত্রা, লক্ষ্মী পুজো অবধি, আর বিজয়ী-সম্মিলনী। কালে-ভদ্রে ইংরিজি বা বাংলা সিনেমা। ভাল বই পড়া। কলকাতা থেকে আনিয়ে সব ক'টি পুজো সংখ্যাই! ব্যাসস, এইই সব!

এখন বাড়িতে কালার-টিভি। ভিডিও। সিনেমা, বাড়ি বসেই দেখে ছেলে-বৌরা। নলিনীও দেখেন। একা-জীবনে টিভির মতো আশীর্বাদ খুব কমই আছে।

কখনও কখনও অবশ্য কোনো বিশেষ ভিডিও ক্যাসেট এনে ভুণ্ড ও গিগি এবং তাদের দু-একজন বন্ধুবান্ধব মিলে, টিভিটা শোওয়ার ঘরে ঢুকিয়ে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে ফিল্ম দেখে। টিভি-র বাক্সর নীচে চাকা লাগানো আছে। নিয়ে যেতে অসুবিধে হয় না কোনো। নলিনী নিজে চোখে না দেখলেও অনুমান ঠিকই করতে পারেন কী থাকে সেইসব ক্যাসেটে। জীবনের এমন এক পর্যায়েই এসে পৌঁছেছেন উনি, যেখানে কৌতূহল, ঔৎসুক্য, ভাললাগা সবই প্রায় নিভে এসেছে, গলে-যাওয়া মোমেরই মতো।

উনি এখন বুঝতে পারেন যে, জ্যোতিষের সঙ্গে থেকে থেকে তিনিও অনবধানে মনের দিক থেকে একটু অনুদার হয়ে গেছেন। অবশ্য ওঁরা যেভাবে বেঁচেছিলেন, ছেলে-বৌরা যে সেভাবেই বাঁচবে এটা আশাও করেন না তিনি।

একদিক দিয়ে অবশ্য ভালই। নলিনী ভাবেন এবং ভেবেই খুশী হন তিনি। তিনি যা পাননি স্বামীর কাছে থেকে, অনেক কিছুই পাননি; তা তাঁর বৌমা তার ছেলের কাছ থেকে যা পায়। তাছাড়া বৌমা স্বাবলম্বীও তো! কত বড় কথা সেটা! ঈর্ষা করেন না, সত্যিই খুশি হন যে, মেয়েরা আর অন্তঃপুরাবাসিনী নেই বলে। ছেলেদের সঙ্গে তারা সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে বলে বেশ ভালই লাগে। এ তো নলিনীদেরই জয় একরকম!

ওঁর বাপের বাড়িতে কিন্তু যথেষ্টই ঔদার্য ছিল। গান, সিনেমা, থিয়েটার এসব দেখা এবং এ নিয়ে আলোচনা করতেন ওঁর ভাইবোনরা মা-বাবার সঙ্গে বন্ধুর মতো। শিশুকাল থেকেই কোনো বইকেই তাঁদের বাড়িতে 'নিষিদ্ধ' করা হয়নি। অক্ষর চেনার পর থেকেই সবরকম বইই পড়েছেন ইংরিজি-বাংলাতে। সাহিত্য নিয়ে আলোচনাও করেছেন সকলের সঙ্গে। দেশি-বিদেশি লেখক, কবি ও নাট্যকারেদের নিয়ে। সেই উদার আবহাওয়া থেকে জ্যোতিষের ঘেরাটোপের জগতে এসে প্রথম প্রথম হাঁফিয়েই উঠতেন তিনি।

জ্যোতিষ মানুষটা ছিলেন পুরোপুরিই বৈষয়িক। এবং বেরসিকও। তবে এরকম স্বামীই হয়তো বেশির ভাগ মেয়েই চায়। কিন্তু নলিনী আদৌ চাননি। বিয়ের পর পর, যখন একে অন্যের শরীরের প্রথম সান্নিধ্যে সব ব্যবধানই ঘুচিয়ে দেয়, সেই সময়টিতেই দুজনের মানসিকতার তফাত অতটা বোঝেননি। তারপর দেখতে দেখতে ভুণ্ড এসেছে। বিয়ের দুবছরের মধ্যে তখন নলিনীর বয়সই বা কী! মোটে কুড়ি। আজকালের দিনে ঐ বয়সের মেয়েরা তো কচি খুকী। ভুণ্ড আসার পর থেকেই জ্যোতিষ রায় নামক পুরুষটির কাছ থেকে নলিনী বসু মনে মনে ক্রমশই দূরে সরে গেছেন। অভ্যাসে জড়িয়ে থেকে, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-যত্ন, রান্না-বান্না, স্বামীর দেখাশুনা, পরিবারের সকলের অসুখ-বিসুখ, ছেলের পরীক্ষা, পড়াশুনা চাকরিতে স্বামীর উন্নতির চিন্তা ঐসব নিয়েই পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবন যে কী করে কাটিয়ে ফেললেন আজ পিছন ফিরে তাকালে তা বিশ্বাস পর্যন্ত করতে চায় না মন।

বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে আসার পর, সেই পৈতৃক বাড়িই রেনোভেট করে জ্যোতিষ তাতে চাকচিক্য দিয়েছিলেন। নলিনী, বাগানে অন্য অনেক গাছের সঙ্গে একটি বকুল গাছও লাগিয়েছিলেন। সেই গাছটিই আজকে তিরিশ বছরের ব্যবধানে মস্ত হয়েছে। যখন তাতে ফুল আসে তখন মনেই হয় না যে তিনি যুবতী নন আজও।

জ্যোতিষের কাছে একদিন জীবানন্দর নাম করায় জ্যোতিষ বলেছিলেন, সে তো আনন্দমঠের চরিত্র। এনে দেবো তোমাকে এক কপি আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্রর।

নলিনী ক্ষীণ প্রতিবাদ করে বলতে গেছিলেন জীবানন্দ নয়; জীবনানন্দ।

অবাক হয়ে চেয়েছিলেন জ্যোতিষ। তাঁর সাহিত্য-পরিক্রমা বঙ্কিমেই এসে থেমে গেছিল, বাংলা-সাহিত্যের বেশির ভাগ সমালোচকরাই যেমন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎবাবুতে এসেই থেমে যান।

আর কিছুই বলেননি নলিনী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝেছিলেন, ওকে বলে লাভ নেই কোনো। তখন এই পাড়ায় লাইব্রেরীও ছিল না। সপ্তাহে একদিন শাশুড়ীর অনুমতি নিয়ে দূরের বেঙ্গলী ক্লাবে গিয়ে বাংলা বই নিয়ে আসতেন। শাশুড়ী গান ভালবাসেন কিন্তু শ্বশুরমশাই ও স্বামী গান গাওয়াকে এক ধরণের অকারণ চাপল্য বলেই জানতেন। "গান গায় খারাপ মেয়েরা" এমন কথাও বলেছিলেন এক সম্পর্কে শ্বশুরমশাই। গভীর রাতে তাঁর বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে-আনা অর্গানটির উপর মাথা রেখে নীরবে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন সেই রাতে তিনি।

বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায়ই শাশুড়ী চলে যান। তারপর থেকেই তাঁর সাধের অর্গানে ধুলো জমতে থাকে। ভৃগুর বিয়ের সময়ই সেই অর্গান আবার বাজান তিনি ছেলে-বৌ-এর ফুলশয্যার রাতে। বাজান অবশ্য গিগির বাপের বাড়ির মানুষদের পীড়াপীড়িতেই। পাকা-দেখার সময়ই টিউনিং করিয়েছিলেন। গিগির বাড়ির মানুষেরাও খুবই আধুনিক এবং উদার।

নলিনীর জীবন, তাঁর বিয়ের পর পর কতরকম ও কত কড়া শাসনেই না কেটেছিল। নিয়ম-কানুন পাল্টে গেছে আজকাল এখন নলিনীই বাড়ি থেকে বেরোতে হলে বৌমার বা ছেলের অনুমতি নিয়ে বেরোন। বেরোবার সময় অবশ্য পান না নিশেষ। চার বছরের নাতি টুটুর সব ভারই তো নলিনীর উপরই। চাকরি-করা ছেলে-বৌ দুপুরে বাড়ি থাকে না। ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে দিনশেষে তাইই...।

তাছাড়া এখানে শিক্ষিত আয়া-টায়াও পাওয়া যায় না মোটেই। নাতি ছিল আগেকার দিনের ঠাম্মাদের আদরের পুতুল ; নষ্ট করার জিনিস। আর এখন শিক্ষিত ঠাম্মারা অনেকেই হয়ে গেছেন আয়া-কাম-গভর্নেস ! তবে মানিয়ে নিয়েছেন নলিনী। মানিয়ে নেওয়াকেই জীবন বলে জেনেছেন। জীবনের স্রোতের বিপরীতে যেতে চাইলে থেমেই থাকতে হয়। মাঝে মাঝেই ভাবেন, ভাগ্যিস টুটুটা ছিলো ! বসন্তের পাখির চিকন গলার ডাকের মতো, বৈশাখের ভোরের হাওয়ার মতো, শ্রাবণের ঘনঘোর দুপুরের বৃষ্টিরই মতো শিশুরাও বিধাতার এক আশ্চর্য দান। অনাবিল, সম্ভাবনাময় ও ঔৎসুক্যে ভরপুর। কলুষহীন, ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, সংসারের এইসব পুথিগন্ধ প্রাপ্তবয়স্কদের ব্যাধির নোংরা হাত ওদের ছোঁয় না। ওদের কাছে থাকাতেও তাই আনন্দ। ফুলবনে থাকারই মতো।

চান করতে-করতেই নলিনী এইসব ভাবছিলেন। কোনো কোনোদিন গুনগুনিয়ে গানও গান। এই চানঘরের সময়টিই তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত, নিজস্ব সময়। কোনো কোনো দিন অর্গানেও গিয়ে বসেন। ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, অতুলপ্রাসাদ, রজনীকান্তর গান, বাজিয়ে গান। অর্গানের ভরাট আওয়াজ শুনে পাশের বাড়ির ভাড়াটে সেন-সাহেবের ছোট মেয়ে শ্রাবণী কখনও কখনও চলে আসে। গান, ভারী ভালোবাসে মেয়েটা। কখনও বা নিধুবাবুর কোনো টপ্পাও গান। অনভ্যাসে টপ্পার দানা আটকে যায় গলাতে। চর্চা না না রাখলে টপ্পা গাওয়া মুশকিল।

গিগিদের পরিবারে গান থাকলেও বাংলা গান-টানের খুব একটা খোঁজ রাখে না গিগি। সে বম্বের মেয়ে। কনভেন্টে পড়াশুনা করেছে। ইংরিজি গান জানে অনেক। ভৃগুকে প্রায়ই বলে একটা পিয়ানো কেনার কথা। বাংলা ও বলতে পারে তবে বাংলা পড়ে অতি কষ্টে। চিঠিপত্র যা লেখার সব ইংরিজিতেই লেখে। "হলিডে"তে গেলে পিকচার পোস্টকার্ড পাঠায় নলিনীকে 'মাই ডিয়ার মাআ' সম্বোধন করে। দোষ নেই কোনো ওর। ওর বাবা ছিলেন নেভীর অফিসার। দিল্লী বম্বেতে বহুদিন থাকার পর বাঙালী সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখাই মুশকিল। জব্বলপুরেও অবশ্য তাই-ই। ছেলেমেয়েরা সব সংস্কৃতিতে অবাঙালীই হয়ে গেল।

চান সেরে বাথরুম থেকে বেরোতেই বাটুমার দুটি চিঠি দিলো ডাক-বাক্স থেকে এনে। একটি চিঠি কামিনীর, মানে নলিনীর ছোট বোনের লেখা।

বাটুমার বয়স কুড়ি-বাইশ। দক্ষিণ ভারতের ছেলে। গায়ের রঙ চকচকে কালো। নারকোল তেল গড়িয়ে পড়ে ঘন কালো ঠাসবুনোন একমাথা চুল থেকে। খোরের মতো সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসে ও। কারণে অকারণে। বাটুমার বাবাও গান-ক্যারেজ ফ্যাক্টরীতে কাজ

করতো। লেবারের। এখন ওরা এখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছে। ছেলেটি বেশ চালাক-চতুরও। পার্টির দিনে ওই সাদা উর্দি পরে ছেলে বৌদের গেস্টদের ড্রিঙ্কস-ট্রিঙ্কস সার্ভ করে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা আঁচড়ে, বাটুমাকে টেবলে খাবার লাগাতে বলেই অন্য চিঠিটা নিয়ে জানালার পাশের চেয়ারে বসলেন উনি। হাতের লেখাটা একেবারেই অচেনা। পোস্টাপিসের ছাপটাও পড়তে পারলেন না। তাঁকে চিঠি লেখার লোক তো খুব বেশি নেই আর! বৌদি মাঝে-মাঝে লেখে ভোপাল থেকে দাদার খবর দিয়ে কামিনী, ক্রীসমাসে ও নতুন বছরে কার্ড পাঠায়। রণিত, ইয়োরোপ, আমেরিকা, সাউথ-ইস্ট-এশিয়া থেকে পিকচার-পোস্টকার্ড। গুণহীনতায় অর্জিত অঢেল পাঁচা টাকার গন্ধ বেরোয় তা থেকে। ট্যাক্স-না-দেওয়া টাকা। উনিও ওদের লেখেন বিজয়াতে ; নববর্ষে। এই চিঠিটা কার কাছ থেকে এলো ? অচেনা হাতের লেখা চিঠি বড়ই উত্তেজনার কারণ হয়।

চিঠিটা ছিঁড়লেন। চমৎকার বাংলা হাতের লেখায় লেখা চিঠিটি।

কলকাতা ১০/১০/৮৫

শ্রীমতি নলিনী রায়, প্রযত্নে জ্যোতিষ রায়/ পাচপেড়ি/ জব্বলপুর/ মধ্যপ্রদেশ।

বেয়ান, প্রীতিভাজনীয়াসু,

আপনি আমাকে মনে করতে পারছেন কি না জানি না!

গিগির বিয়ের সময় আমাকে দেখিছিলেন। ওর বিয়ের সময়ে কলকাতা থেকে বম্বে গিয়েছিলাম সস্ত্রীক। তারপর বম্বে থেকে ওর বৌভাতে জব্বলপুরে। সেখান থেকেই কলকাতায় ফিরি।

আমার নাম শুভাশিস বোস। গিগির মেজমামা হই।

শুনেছেন নিশ্চয়ই গিগির কাছে যে, আমার স্ত্রী সীমা চলে গেছেন বছর দশেক। অত তাড়ার কী ছিলো জানি না! অবশ্য আমার মতো স্বামীর সঙ্গে ঘর করা যে-কোনো মহিলার পক্ষেই ক্লান্তির, হয়তো বিরক্তিরও যে, তা অস্বীকার করি না। ইউট্রাসে ক্যানসার হয়েছিলো ওর। সীমার খুব দেশ বেঁড়ানোর শখ ছিলো। বলতাম, রিটায়ার করার পর সারা ভারতবর্ষ ঘুরবো দু'জনে। ওর কপালে ছিলো না। আমি তাই একাই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কতটা বেড়াবার জন্যে আর কতটা নিজেকে আবিস্কার করার জন্যে, জীবনের সালতামামী লেখার জন্যে তা নিজেই ঠিক জানি না। একা-একা বড় হাঁফ ধরে যায়। তাই-ই প্রতি বছর পুজোর পর বেরিয়ে পড়ি।

গিগির ফুলশয্যার রাতে আপনার গানও শুনেছিলাম। আমরা অনেকেই তো এসেছিলাম বম্বে থেকে। আপনি অর্গান বাজিয়ে গেয়েছিলেন। "ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি। রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি॥ তুমি এসো, হৃদে এসো, হৃদবল্লভ হৃদয়েশ, মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ করুণ হাস্যভাতি॥

ওহে সুন্দর গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি .....।"

গেয়েছিলেন অবশ্য আমার স্ত্রীর পীড়পীড়িতেই। কিন্তু কী গান! এখনও যেন কানে লেগে আছে। গান যে ভালোবাসে, গানের দাম শুধু সেই-ই বোঝে। গান যেমন ব্যথা হরায় ; তেমন ব্যথিতও করে।

আমি জব্বলপুরে যাচ্ছি। কুড়ি তারিখে পৌঁছব। আপনার অতিথি হয়েই থাকবো ক'দিন। তারপর চলে যাবো কান্হার জঙ্গলে।

আপনাকেও দাওয়াত দিয়ে রাখলাম।

আপনার মুখশ্রীর মধ্যে এমন কিছু ছিলো যে আপনাকে ভুলে-যাওয়া অসম্ভব। না, সৌন্দর্যর কথা বলছি না। তা তো অনেকেরই থাকে। সৌন্দর্য ছাপিয়ে যা ভাস্বর হয়েছিলো সেই উজ্জ্বল রাতে, তা আপনার অন্তরের অকলুষ সারল্য ও চারিত্রের দৃঢ়তা। একজন সৎ মানুষ হিসেবে সেই একদিনের পরিচয়েই আপনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন।

সীমাকে প্রায়ই বলতাম আপনার কথা। আপনার গানের কথা। মেয়েদের প্রত্যেকেরই মধ্যে এক ধরনের পজেসিভনেস থাকে। তা আপনারা স্বীকার করুন আর না-ই করুন। এক ধরনের ঈর্ষাও হয়তো। চমৎকার মেয়ে সীমাও কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলো না। হয়তো সেই জন্যেই আপনার প্রতি আমার মনোভাবের আগুনটা যাতে হাওয়া না পায়, সে বিষয়ে সে যথেষ্টই সচেতন ছিলো।

এখন সীমা নেই, জ্যোতিষবাবুও নেই , গিগি আর ভৃগু তো সারাদিন বাইরেই থাকে । এই ক'দিন জব্বলপুরে আমি শুধুই আমার সুন্দরী বেয়ানের কাছে থাকবো । প্রেমও করা যেতে পারে । প্রেমতো এই বয়সেই হয় ! কি বলেন ? গিগিরা এই বয়সে প্রেমের কী জানে ? শরীরের কাঁটা বন পেরিয়ে এসে তবেই না মানুষ প্রেমের ফুলবনে পৌঁছয় ।

ভাবতেই দারুণ লাগছে ।

সত্যি কথা বলতে কী একটু ভয়-ভয়ও করছে । আমার বিপদটা কী জানেন ? মনের বয়স আমার পঁচিশে এসেই আটকে গেছে । কিন্তু বাইরের খোলটা জরাজীর্ণ, বড় কমজোরি হয়ে গেছে । ভিতরের এই উদ্দাম, উচ্ছ্বাস ; জীবনকে নিংড়ে নেওয়ার সাধে সব সময়ই বাদ সাধছে এই বাইরের খোলটা ।

গিগি আর ভৃগুকেও আলাদা চিঠি দিলাম । আমার এই প্রেমপত্র, থুরি, স্তুতি বা নিবেদন যাই-ই একে বলি না কেন, ওদের না দেখাই ভালো । ওরা ওরা, আমরা আমরা । আমাদের বোঝে না ওরা ।

ভালো থাকবেন । অন্তত আমি যে ক'দিন থাকবো জব্বলপুরে, সব সময়ই সুন্দর সেজে থাকবেন ।

আমি বড়ই রোম্যান্টিক মানুষ । তার জন্যে সারা জীবনে দুঃখও কম পাইনি । যেটুকু বাকি আছে জীবনের, তাতেও যে আরও পেতে হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই ।

নমস্কার জানবেন ।

বিনত ইতি

শুভাশিস বোস

নলিনীর হাত-পা কাঁপতে লাগলো চিঠিটি পড়ে ।

না, এটি যে প্রেম-পত্র নয়, সে কথা বোঝার মতো বয়স ও অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে । কিন্তু প্রেমের অভিনয়, প্রেম-বিষয়ক ঠাট্টা যে এতে আছে তাও না বোঝার মতো বোকা তিনি নন । এ চিঠি বেদের ঝুড়ি । তা থেকে সাপ বেরুবে কি বেরুবে না, সে কথা ভবিষ্যতই বলতে পারে ।

প্রেমের চিঠি ঠাট্টা করেও তাকে এই জীবনে কেউই লেখেনি । এই প্রথম শীতের আমেজভরা দুপুরেও নলিনীর দু' হাতের পাতা ঘেমে উঠলো । ফ্রিজ খুলে জল খেলেন এক গ্লাস । তারপর বাটুমা বললেন, কি রে ? আর কোনো চিঠি আসেনি ?

কই ? না তো ।

সে কি ! আরও তো একটা আসার কথা ।

না । আসেনি । হয়তো বিকেলের ডাকে আসবে ।

বিকেলের ডাক দেখিস তো মনে করে । নইলে চাবিটা আমাকেই দিয়ে যা । তুই তো এখন রোদে বসে ছোটুয়াদের সঙ্গে তাস খেলবি ।

হ্যাঁ । কত্ত তাস খেলতে পারি ! একটু পরই তো যেতে হবে টুটুকে আনতে স্কুল থেকে । আপনি খাবেন না মা ? অনেক বেলা হলো আজ ।

খাবো ? ও হ্যাঁ । দে, দে ! আসছি এক্ষুনি ।

বলেই, নলিনী আরেকবার ঘরে গেলেন । ড্রেসিং-টেবলটার সামনে দাঁড়ালেন । কার্তিকের রোদ ঘরে এসে, গ্রিলের ডিজাইনের ছায়া বুকে করে মেঝেতে বসেছিলো নিঃশব্দে হালকা হলুদ শাড়ি পরে । ডানা-মোড়া পা নিশ্চুপ পাখিরই মতো । বাগান থেকে বুলবুলি ডাকছিলো নিচু স্বরে । একটা সাইকেল-রিক্সা যাচ্ছিলো ডান দিকের পথ বেয়ে সিভিল লাইনস্ -এর দিকে । জানালার প্যারাপেটের উপরে স্তূপীকৃত বোগোনভোলিয়ার ম্যাজেন্টারঙা ছায়া ফুটে উঠেছিলো আয়নার লেসের জালের পাহারা-ঘেরা কাঁচে । অনেক, অনেকই বছর পরে নলিনী নিজের মুখের দিকে যত্নে, আদরে এবং বোধহয় একটু লজ্জায় তাকালেন আয়নায় ।

আয়নার সামনে দাঁড়ানোও বোধহয় একটা "অভ্যেস"। রোজই দাঁড়ান । কতবারই তো দাঁড়িয়েছেন, কত সহস্রবার ; এই আয়নারই সামনে গত তিরিশ বছরে কিন্তু আজকের মতো ভালোবাসায়, নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দে হয়তো খুব কমই তাকিয়েছেন নিজের প্রতিফলিত ছায়াটির দিকে । সামনের দাঁত পড়ে গেছে দুটি । মাথার ঠিক মাঝখানে একগুচ্ছ চুল সাদা হয়ে গেছে । অনেকটা ইন্দিরা গান্ধীর মতো । জুলপী তো পেকে গেছেই । লজ্জা করলো খুবই । আবার খুব ভালোও লাগলো ।

খেতে যখন বসলেন, লক্ষ্য করলেন ; বাটুমা অবাক চোখে চেয়ে আছে তাঁর মুখে।

কী হলো তোর ? দেখছিস কি ?

লজ্জা পেয়ে উনি বললেন।

বাটুমা চোখ না সরিয়ে অবাক-হওয়া গলায় বললো, নাঃ। এমনিই।

খাওয়া শেষ ঘরে এসে পানের বাটা বের করলেন।

আজও রাতে বাড়িতে পার্টি আছে। ছেলে-বৌ-এর বন্ধু-বান্ধবরা আসবে। নাচগান হবে। হুইস্কি-টুইস্কি খাবে। স্বামী জ্যোতিষ কিন্তু মদ ছুঁতেন না। কোনো নেশা ছিল না ওঁর। ভুগু অন্যরকম হলো। জ্যোতিষ না খেলেও নলিনীর নিজের বাবার এসব শখ ছিলো। শুধু হুইস্কি-টুইস্কিই নয়, জীবনের নানা সুন্দর আর আনন্দর ব্যাপারেই ওঁর অদম্য কৌতূহল ছিলো। ভোপালে তাঁদের বাড়িটি ছিলো আনন্দ নিকেতন। বাঙালী সংস্কৃতির চর্চার পরাকাষ্ঠা ছিলো সেখানে অথচ সাহেবী সংস্কৃতির দ্বারও রুদ্ধ ছিলো না।

দাদা সীতেশ নলিনীর চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড়, ভাবে প্রায় পিঠোপিঠিই। সীতেশও বাবার মেজাজ ও মানসিকতা পেয়েছিলো। গানবাজনা, সাহিত্য চর্চা, খেলাধুলো এবং হুইস্কি-খাওয়াও। বাবারই মতো, ও-ও বলতো : গুণি হওয়া কঠিন কিন্তু গুণগ্রাহী হওয়া কঠিনতর। এখন সবই গেছে বেচারার। গত তিন বছর হলো প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী। একমাত্র বোন, নলিনীর ছোট। কামিনী। তার জীবন কিন্তু বয়ে গেছে অন্য খাতে। কামিনীর সাহস ছিলো, জেদ ছিলো, নিজস্ব মতামত ছিলো কিন্তু রুচি ছিলো না। বোকাও ছিলো একটু। সামান্য অবস্থার এক ধূর্ত সহপাঠিকে সে বিয়ে করেছিলো। ভালোবাসার বিয়ে। রণিত ছিল বকা, মিথ্যেবাদী, চালিয়াৎ এবং অভিনেতা। জীবনের অভিনেতা, মঞ্চের নয়। এলাহাবাদের ছেলে। অথচ দিনকাল এমনই হলো যে সেই রণিতই এখন দারুণ সাকসেসফুল। যার টাকা আছে সেই-ই সাকসেসফুল এখন, সে টাকা যে-ভাবেই অর্জিত হোক না কেন। এখন এলাহাবাদে সাহেব-মেমসাহেবদের মতোই থাকে ওরা। মস্ত বড় ব্যবসাদার। চারটে গাড়ি। বাড়ি, বাগান-বাড়ি, ঠাট-বাট, বেয়ারা-বাবুর্চি। এই সব কারণেই একমাত্র দিদি নলিনীর সঙ্গে সম্পর্কটা আর ছেলেবেলার মতো নেই। সম্পর্ক বলতে যা বোঝায় তা নেইই বলতে গেলে। কামিনী খুবই বড়লোক।

তবুও ঈর্ষা করেননি তিনি কোনোদিনও ছোটবোনকে। বরং অনুকম্পাই করেছেন। দুঃখ হয়েছে এই জন্যে যে, তাঁর অনেক গুণে গুণী বোনটি একেবারে বদলে গেছে একটি খল, ধূর্ত মানুষের হাতে পড়ে। কামিনী নরম প্রকৃতির মেয়ে ছিলো। ওকে কাদার তাল পেয়ে রণিত নিজের চরিত্রেরই ছাঁচে গড়ে নিয়েছে পুরোপুরি।

কিন্তু নলিনী নিজের জীবনে তা হতে দেননি। দেননি বলেই, অনেকই কষ্ট পেয়েছেন। এখনও পান। এই সব কষ্ট বাইরে থেকে দেখা যায় না। এই সব বদলও নয়। ভেতরে ভেতরে এই কষ্ট বুকের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তক্ষরণ ঘটায়। এ কষ্ট বড় কষ্ট। এই কারণে নলিনী একটু গর্বিতও বোধ করেন যে, শ্বশুর বাড়ি, স্বামী, ছেলে, সকলের প্রতি সব কর্তব্য পুরোপুরি করেও নিজের নিজস্বতাকে, তাঁর অন্তর্জগতকে কখনওই নষ্ট হতে দেননি তিনি। দুঃখ হয় এই ভেবেও যে, ছেলে বৌ-এর দ্রুতগতি জীবনের সঙ্গে চকচকে জুড়ি-গাড়ির ছিমছাম অসক্ত-কোচয়ান-এরই মতো যুক্ত থেকে এই নিজস্বতা নিয়ে কীই বা করবেন ? এই একটা জীবন, নিজের যা-কিছু শখ-আহ্লাদ ছিলো তার সবকিছুই ফেলা গেলো এ-জন্মের মতো।

তবুও, যেসব শাশুড়ী নিজেদের সমস্ত অপ্রাপ্তি নিজেদের ছেলের বৌদের উপরে চাপিয়ে এক ধরণের বিকৃত আনন্দ পেয়ে থাকেন নলিনী তেমন অশিক্ষিতদের দলে কখনওই ছিলেন না।

জ্যোতিষের কোনো বন্ধু ছিলো না। স্বামী ছাড়া, অনাত্মীয় কোনো পুরুষের সঙ্গে মেশার কোনো সুযোগই ছিলো না। বিবাহিতা, অন্তঃপুরবাসিনী নলিনীর। গিগিকে এই বাবদে একটু ঈর্ষা যে করেন না এমনও নয়। ভয়ও হয় খুব। এই অবাধ মেলামেশার মধ্যে ঘর ভাঙার গোপন বীজও বোধহয় সুপ্ত থাকে। বিপদ আছে জেনেও ওরা বিপজ্জনক ভাবেই বাঁচে।

কে জানে ? বিপদের কথা ওরা জানে কি ?

ভালোবাসা এমনই জিনিষ যে, তাকে তো আগে থেকে বোঝা যায় না। তার উপরে আস্তরণ একটা থাকেই। যতই পাতলা হোক। সেই আস্তরণের ভিতরে লাল, হলুদ, খয়েরী শুকনো পাতার নিচের সাংঘাতিক সাপের মতোই নীরবে লুকিয়ে থাকে ভালোবাসা। সেই আস্তরণ

কোথাও প্রীতির, কোথাও করুণার, কোথাও সহমর্মিতার অথআ সমবেদনারও । সেই আস্তরণ হঠাৎ সরে গেলেই ভালোবাসা চোখ-ধাঁধিয়ে বুক-কাঁপিয়ে ভূমিকম্প তোলে । শরীরও কম কিছু নয় । আর ভৃগু আর গিগিদের বয়সে শরীরের কাছে শরীর থাকা তো আগুন নিয়ে খেলারই সমান । অথচ ওরা কেমন স্বাভাবিকভাবে মেশে । ছেলে বৌ-এর সঙ্গে তাদের অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবদের কারো সঙ্গে যে প্রেম হয়ে যাবে কখনও এমন মনেও হয় না কিন্তু দেখে । আশ্বস্ত হন নলিনী । সেই সঙ্গে দুঃখিতও হন একটু । ওরা বোধ হয় সবকিছুই হিসেব কোরে করে । প্রেমের সাপ, শরীরী সাপ হঠাৎ যদি কাউকেই ওদের না কামড়ায় তো বলতে হবে ওরা আর মানুষ-মানুষী নেই : যন্ত্রই হয়ে গেছে বোধহয় । ওদের চরিত্রগুলো সব বুঝি ইস্পাতের পাত দিয়েই মোড়া ! একটু বেশি । অকাল-পক্কও ওরা । যে-সব জানাকে সমস্ত জীবন ধরে তিলতিল করে জানতে হয় সেইসব জানাকে যে ওরা এই বয়সেই জেনে গেছে । জীবনের সব স্বাভাবিকতাকেই বোধ হয় ওরা এদের আধুনিকতার মোড়কে মুড়ে দম-বন্ধ করে মেরে ফেলছে ।

এর ফল ভালো কখনোই হতে পারে না ।

আধুনিকতাটাই অভ্যেস হয়ে গেছে ওদের । "অব্যেস" হয়ে গেলে জীবন, জীবন থাকে না আর । নলিনীরাও অভ্যেসের ভারে ন্যুব্জ ছিলেন । কিন্তু ভিতরে একটি জ্বালাও ছিলো সবসময়ই । ভৃগু, গিগি আর ওদের অসংখ্য হিহি-হা-হা-করা বন্ধু-বান্ধবীরা বোধ হয় সেই "অব্যেস"টাকেই বর্ম হিসেবে পরে নিয়েছে । মানুষ হিসেবে এই প্রজন্মর ছেলেমেয়েরা বড় স্টিরিওটাইপড, একঘেয়ে বিস্ময়হীন হয়ে গেছে । নলিনীর মনে হয় । না হয় তারা নিজেরা কখনও বিস্মিত, না করে অন্য কারো বিস্ময়েরও উদ্রেক । ওদের সকলেরই বসার ঘর, শোওয়ার ঘর, ছেলে-মেয়েদের ঘর হুবহু একই রকম । কারোই স্বাতন্ত্র্য নেই, বিশেষ রুচি নেই । ওদের প্রত্যেককেই একই রকম, একই ছাঁচে ঢালা বলে মনে হয় নলিনীর ।

গিগি আর ভৃগু দুজনেই স্টেশনে গেছিলো । শুভাশিসকে আনতে ।

বম্বে মেল, যেটা নাগপুর হয়ে বম্বে যায় : কলকাতা থেকে এসে জব্বলপুরে পৌঁছয় বিকেলে । হাওড়া থেকে ছাড়ে, আগের দিন সন্ধেতে । তবে লেট থাকে প্রায়ই ।

ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে : ওদের বাড়িতে ফেরার । এখনও এলো না যখন তখন ট্রেন নিশ্চয়ই লেট আছে । নলিনী ভাবছিলেন, রান্নাঘরে বসে ।

কড়াইশুঁটির কচুরি খাওয়াবেন বেয়াইকে । পুরটা যত্ন করে করে রেখেছেন । তবে, ঝাল দেননি । ওরা ফিরলে, গিগি বলেছে যে, ওঁকে বলে দেবে তার মেজমামাকে জিগগেস করে ; তিনি ঝাল কেমন খান । বহুদিন তো দেখা-সাক্ষাৎ নেই । তাই গিগি নিজেও জানে না মেজমামা চায়ে ক'চামচ চিনি খান, ঝাল খান কী না : সর্ষে তেলের রান্না খান না বাদাম তেলের?

শুভাশিসের বয়স ষাট । নিজেই লিখেছিলেন । গিগির বাবারই সমবয়সী । একটা মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো যে, তা বম্বের চিঠিতেও জেনেছিলেন । খাওয়া-দাওয়ারে নিশ্চয়ই বাধা বন্ধ আছে । গিগির মাও তো আর নেই । তিনিও হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাকে চলে গেছেন তেপান্ন বছর বয়সেই । গিগির বাবার সঙ্গেও কলকাতার বিশেষ যোগাযোগ নেই-ই বলতে গেলে, যা শোনেন গিগির কাছে । চিঠি লেখার অভ্যেস গিগির বাবার একেবারেই নেই । বম্বের আধুনিক মানুষেরা ফোনে বা টেলেক্সেই এখন খবরের আদান-প্রদান করেন নাকি । চিঠি ব্যাপারটাই মধ্যযুগীয় ভারী ফার্নিচারেরই মতো বাতিল হয়ে গেছে । অতি ছিপছিপে, মেদহীনতায়-বিশ্বাসী আধুনিক জীবনে এসব অচল ।

হালকা ছায় পারের একটি সাদা টাঙ্গাইল পরেছেন নলিনী । কালো ব্লাউজ । আলমারী খুঁজে-পেতে সবচেয়ে ভালো কালো "ব্রা"-টি বের করেছেন । গিগিই কিনে দিয়েছিল প্রথম চাকুরী পেয়ে । তার বুকের কাছে আবার একটি ফুল ।

দিনে দিনে কতই যে হবে !

লজ্জা পেয়ে নলিনী পুত্রবধূকে বলেছিলেন, এ কী ! বুড়ো মানুষরা আবার এসব পরে কী করবে?

গিগি হেসে বলেছিলো, তুমি এমন কোরো না মা ! ঐ ফুল দেখতে যাচ্ছে কে ? তুমি নিজে ছাড়া ? তাছাড়া কোম্পানী তো বয়স দেখে বানায় না এসব : বানায় ... তাছাড়া, তোমার বয়সটাই বা কি ? এই বয়সে কত মেয়ে বিয়ে করে ।

আজ কিন্তু ঐ ফুল-তোলা ব্রা-টিই পরে ফেললেন নলিনী। দেখা অবশ্য যাবে না। ব্লাউজ খুললেই শুধু সেই ফুল চোখে পড়তে পারে। তাই-ই তাঁর লজ্জিত হবার কিছুই নেই। তবুও লজ্জিত কেন যে হচ্ছেন বুঝতে পারছেন না। সকালে শ্যাম্পুও করেছিলেন। অনেকদিন পর। মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছেন। বড়ই অসস্তিতে আছেন নলিনী। কখনও এমন হয়নি আগে। শুধু একটি চিঠি যে এতখানি বিস্রস্ত করে দিতে পারে তাঁর জীবনকে তা ভেবেই অবাক হচ্ছেন।

ভৃগুর ফিয়াট গাড়ির হর্ন বাজলো হঠাৎই গেটের কাছে। নলিনী বাটুমাকে তাড়া দিয়ে পাঠালেন বাইরে। পাঠিয়েই, দৌড়ে একবার ঘরে গেলেন। না, চুলটা ঠিকই আছে। ফিরে, রান্নাঘরের বারান্দাতে এসে মোড়ার উপরে বসে রইলেন। ওঁর হাঁটু কাঁপছিল। ছিঃ ছিঃ। প্রেমের অভিনয়ের একটি চিঠিতেই যদি এমন হতে পারে তবে সত্যি প্রেম হলে কী না হতো!

হঠাৎই মনে হলো নলিনীর, গিগির মেজমামা শুভাশিস জব্বলপুরে না এলেই ভালো ছিলো। ওঁর মনে, কেন জানেন না, 'কু' ডাক দিচ্ছে। কিছু একটা ঘটবে। যে-মনে মরচে পড়ে গেছে, যার সবকটি টায়ারই বসে গেছে মাটিতে দীর্ঘদিনের অব্যবহারে, যার ব্যাটারী চার্জ না পেয়ে-পেয়ে ডিস্চার্জ হয়ে রয়েছে, যার হর্ন বাজে না; সেই মনে অবেলায় এত টানাপোড়েন সইবেই বা কেন?

গলার স্বর শুনেই চমকে উঠলেন নলিনী। দরাজ; ভরাট গলা। পুরুষের যেমন হওয়া উচিত।

কৈ রে গিগি? বাড়ির মালকিন কোথায়? আমি তো তোদের অতিথি হয়ে আসিনি এখানে। যাঁর অতিথি, তিনি অভ্যর্থনা করে ভেতরে না নিয়ে গেলে যাবোই না। এই দাঁড়িয়ে রইলাম সিঁড়িতে তাহলে।

নলিনী মনে মনে বললেন, ঢঙের নাগর।

ভৃগু, মা! মা! তুমি কোথায় বলতে বলতে রান্নাঘরে ঢুকে বিরক্তির গলায় বললো, মা! তুমি মাঝে মাঝে এমন পর্দানসীন ব্যবহার করো যে, হাসি পায়। গিগির মেজমামা যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দরজায়! চলো!

মাঝে মাঝেই নলিনীর মনে হয় যে, এই প্রজন্মের সব ছেলেই, ছেলে হিসেবে যত না ভালো জামাই হিসেবে তার চেয়ে অনেকই বেশি ভালো। তাঁর নিজের ছেলেও।

আজকালকার জামাইদের কোনো তুলনাই হয় না। অতুলনীয় তারা। নিজের মেয়ে না থাকায়, নিজের জামাই-এর স্বাদ থেকে তাঁকে এ জীবনে বঞ্চিতই থাকতে হলো।

মোড়া ছেড়ে উঠে ঘোমটাটা মাথার উপরে ছুঁইয়ে চললেন তিনি ছেলের সঙ্গে।

ভৃগু বললো, আবার ঘোমটা-ফোমটা কেন? ওঁরা কলকাতার লোক। তার উপরে সাউথ-ক্যালকাটার। তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

নলিনী শুনলেন না। ঘোমটাতে মুখ ঢাকেন না তিনি কখনওই। কপালের উপরে সিঁথি অবধি ঘোমটা টেনে দিলে তিনি নিজেকে অনেক বেশি সম্ভ্রান্ত দেখেন। আত্মবিশ্বাসও সঙ্গে থাকে তার। তাছাড়া তিনি যে শিকড়হীন নন, ভেসে-যাওয়া নৌকা নন বা ছিলেন না; জ্যোতিষ রায় বলে তাঁর যে একটি "বয়া" ছিলো একসময় জীবনের নদীতে, যাঁর সঙ্গে বা যাঁর স্মৃতির সঙ্গে তিনি এখনও এক অচ্ছেদ্য অদৃশ্য শিকলে বাঁধা এই সত্যটাও ঘোমটার পরশে যেন অনুভব করেন নলিনী। ঘোমটাটা যেন সুরক্ষার কবচ। ঘোমটা ছাড়া, পরপুরুষের সামনে যেতে ভয় করেছে চিরদিনই।

অভ্যেস।

বাঃ। ভারী চমৎকার বাগান করেছিস তো তোরা। ওটা কিরে? বন্সাই? বাঃ বাঃ। কার শখ এসব?

সবই মায়ের। মায়ের যত্নেই বাগান। বহুবছরের পুরোনো সব দুষ্প্রাপ্য গাছ আছে। ভৃগুর তো শখ-টখ নেই।

কি শখ?

শুভাশিস শুধোলেন।

কোনো শখই নেই! তার বাগানের শখ। বাবারও বিশেষ শখ ছিলো না। বাবা তো অবশ্য আমার বিয়ের মাস ছয়েক পরেই চলে যান।

আর তোর ?

শুভাশিস শুধোলেন।

আমার শখ থাকলেও সময় নেই। সবই মায়ের করা ...।

গিগি বললো।

অ্যাই যে বেয়ান! আপনি তো আচ্ছা মানুষ! কোথায় ভাবলাম, গাড়ি থেকে নেমেই শুনতে পাবো অর্গান গমগমিয়ে বসবার ঘর থেকে গান ভেসে আসছে "ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি,..." তা না, আপনাকে রান্নাঘর থেকে ধরে আনতে হলো ভৃগুর। আমি কি শুধু খেতেই এসেছি এখানে ? তাই-ই ধারণা আপনার ? ছিঃ ছিঃ!

নলিনী বললেন, হাত জোড় করে ; নমস্কার।

নমস্কার। নমস্কার। এবারে চলুন দেখি কী এতক্ষণ রাঁধলেন আমার জন্যে! টেস্ট করে দেখি। আপনার বৌমা তো শাশুড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বললো, যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না এই প্রশ্ন তার শ্বশুরমাতা নলিনীবালা সম্বন্ধে নাকি একেবারেই করা চলে না। যেমন রাধেন, তেমন সাজেন, তেমন ঘর সাজান আর তেমনই গান গান।

গান ? কে বলল ? গিগি ?

কথা ফুটল প্রথম নলিনীর গলায়।

গিগি মেজমামার কথার প্রতিবাদ করতে গেলো।

ভৃগু গিগির কথা কেটে বললো, মেজমামা। চলুন, চলুন। ভিতরে চলুন। বসুন। হাতমুখ ধুয়ে নিন। কিছু খান। তারপর কথা হবে।

ভৃগু আবার বলল মামাশ্বশুরের দিকে চেয়ে, আপনাকে তো সহজে ছাড়ছি না। এসেই যখন পড়েছেন।

ভৃগুর অবশ্য, গিগির বৌভাতের পরে মেজমামার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। বিয়ের পর কলকাতায় তিনবার গেছিলো। মেজমামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো প্রথম দুবার। নেমতন্ন করে খাইয়েওছিলেন। কিন্তু মেজমামা হয় দিল্লী, নয় বম্বে, নয় মাদ্রাসে ছিলেন কাজে। দেখা হয়নি। শেষবার মেজমাইমা ছিলেনই না, পরপারে চলে গেছিলেন। মেজমামীমা সেবারও ছিলেন না কলকাতায়।

শুভাশিস বললেন, ভিতরে যেতে যেতে, হ্যাঁ গান। বেয়ান, গানের কথাই তো বলছিলো আপনার পুত্রবধূ।

গান তো আমি ...

গিগি বললো, না মেজমামা। মা চানঘরে গান করেন অনেক সময়ই।

তাছাড়া আমি ভৃগুর কাছেও অনেক শুনেছি ওঁর গানের কথা। আমার ফুলশয্যার রাতে গেয়েছিলেন, মনে নেই তোমার ? ওই। এমনিতেই কিন্তু গান শোনান না একেবারেই।

গান গাইতে নিতে জানা চাই রে। তোর মতো বেসুরো লোকের কাছে গানের কথা শুনবো না আমি। তোর শাশুড়ীর গান আমি নিজ কানে শুনেছি। আর কিছু না থাক, কান ব্যাপারটা বিধাতা আমাকে দিয়েছেন কী রে ?

হ্যাঁ। তা মানতেই হবে। গিগি বললো, তোমার বাড়ির বেড়ালটাও নাকি সুরে কাঁদে। পাড়ার লোকে বলে।

তোর শাশুড়ীর গান শুনেই তো তোর মা বিয়ে ঠিক করেছিলেন এখানে। তুই জানিস না। আমাকে রুমু চিঠি লিখেছিলো সম্বন্ধ ঠিক করেই। চমৎকার! ঘরে ঘরে এমন শাশুড়ী হোক!

এমন বৌমাও! কী বলো মা ?

গিগি বলল, হাসতে হাসতে।

আর জামাই বুঝি নয় ?

ভৃগু বললো অনুযোগের সুরে।

আলবাৎ! জামাই-এর তো তুলনায় নেই। তা আমার দাদুভাই কোথায় ? তাকে যে দেখছি না। টুটুবাবু ?

সে গেছে বেড়াতে।

নলিনী বললেন, নিচু গলায়।

কার সঙ্গে গেলো মা ? বাটুমাতো এখনেই।

গিগি চিন্তিত গলায় বললো।

শ্রাবণী নিয়ে গেছে গাড়ি করে। ওর বাচ্চাদের নিয়ে গেলো। বললো ট্রেন লেট থাকবেই কাকীমা। আমি জানি। মোগলসরাইতে লেট হয়ে যায় রোজই, মেক-আপ করতে পারে না আর। গিগিরা ফেরবার আগেই চলে আসবো।

বাঃ। বলেই, উঠে দাঁড়ালেন শুভাশিসবাবু তারপর দেওয়ালে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ঐ ছবিটা কার আঁকা রে ?

কোনটা ?

বলে, গিগি আর ভৃগু দু-জনেই বোকার মতো চেয়ে রইলো দেওয়ালে।

ওঃ ! ওটা ? ওটা আমার এক বন্ধুর দিদি দিয়েছিলেন বিয়েতে। ফ্রেমিং করে।

কী করেন তিনি ? মানে তোর বন্ধুর দিদি ? ছবিটার কাছে গিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন শুভাশিস।

বম্বের জেহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে কাজ করে। নাম লীনা। লীনা সরাকর।

ওরিজিনাল কি ? ছবিটা ?

কে জানে ?

তাচ্ছিল্যের গলায় বললো গিগি।

স্বগতোক্তির মতোই শুভাশিস বললেন, এটা প্রিন্ট।

এটি কার ছবি জানিস ? গিগির দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন।

না তো !

বিকাশ ভট্টচার্যি। আমার বন্ধু সুধীরের ছাত্র ছিলেন বিকাশবাবু। সুধীরের অফিসেই একদিন আলাপ হয়েছিলো। ফেমিনিন ফর্ম-এ বিকাশবাবু একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন। নাম করেছেন খুবই।

সুধীরবাবু কে ?

আরে সুধীর রে। সুধীর মৈত্র। নাম শুনিস নি ? সমীর সরকার, সুধীর মৈত্র এঁরা সব হলেন গিয়ে দিকপাক ইলাস্ট্রেটর। ওঁরা ইলোস্ট্রেশন্-এ চলে এলেন আর ফাইন-আর্টস-এর আজকে কত আদর ! ঈজ্জৎ তো বটেই, পয়সাও। দুঃখের কথা এইই যে, ওঁদের কেউই যোগ্য সম্মান দেয় না। কেউ কেউ অবশ্য দেন। এইটেই একমাত্র সান্ত্বনা। বিকাশবাবুর কথা তো আমি নিজেও জানি।

নলিনী চুপ করেই ছিলেন। তাঁর জ্ঞানত এ বাড়িতে ছবি বা গান নিয়ে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে বা তাঁদের কোনো আত্মীয়-বন্ধুকেও কোনোদিনও আলোচনা করতে শোনেননি। মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছিলেন উনি। এক নতুন জগতের আভাস যেন মনের দিগন্ত রেখায় আভাসিত হচ্ছিলো। এইসব ভাবতে ভাবতেই কড়াইশুঁটির কচুরির 'পুর'-এ ঝাল দেবেন কী দেবেন না তা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হলো না গিগিকে। আর মেয়েটাও সত্যি তেমনই ! নলিনীর দিকে তাকাবে তো একবার ! নলিনীর দু পায়ের সব জোর যেন কে কেড়ে দিয়েছে। কী যে হলো।

চল্ বাথরুম কোথায় ? কোনটা আমার ঘর।

শুভাশিস বললেন।

এই যে ! মেজমামা ! এইদিকে।

বলেই, ভৃগু ওঁকে নিয়ে গেলো ওর ঘরের দিকে।

গিগি বললো, ও। মা ! তোমাকে বলতেই ভুলে গেছিলাম। মেজমামা খুব বেশি ঝাল খান কিন্তু।

হার্ট-অ্যাটাকের পরও ? সে কি ?

বিস্মিত গলায় বললেন নলিনী।

বললেন তো অ্যাটাকের পর বেশি করে খান আরও।

উচিত নয়।

স্বগতোক্তির মতো বললেন নলিনী। তারপর চলে যেতে যেতে গিগিকে বলে গেলেন, টেবিলটা ঠিক করে দে গিগি। আমি গরম গরম ভেজে পাঠাবো। তুইই দে। হাতটা ধুয়ে নিস বেসিনে। বাটুমাকে দিয়ে পাঠাবো আমি রান্নাঘর থেকে।

মিষ্টি কি বের করবো ফ্রিজ থেকে ? মা ? এখন ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। বার করে প্লেটে করে সাজিয়ে রাখ। তুইও বসে পড়িস ওদের সঙ্গে।

চোখ বড় বড় করে গিগি, গলা নামিয়ে বলল, মাথা খারাপ তোমার! তুমি যখন একা থাকো মা, তখন তোমার কাছে সব লিবার্টি নিতে পারি। তা বলে, বাপের বাড়ির লোকের সামনে? মেজমামার মারফৎ বম্বেতে বাবা এবং সারা কলকাতা জেনে যাবে যে, শাশুড়ীকে দিয়ে আমি ঝি-এর মতো কাজ করাচ্ছি। পরের পোস্টেই বাবার চিঠি আসবে বম্বার্ড করে আমাকে। বিয়ে হয়ে গেছে আমার। তুমিই এখন আমার অনেক বেশি আপন আমার বাপের বাড়ির লোকদের চেয়ে। তুমি কিছু মনে করো না, উঁ্য আর গ্রেট। কিন্তু ওঁরা তো মনে করতেও পারেন। মেজমামা খুব ব্রড-মাইন্ডেড, চিরদিনই। আমার মায়ের সবচেয়ে প্রিয় দাদা। কিন্তু মেজমামীমা, বাগবাজারের মেয়ে। বেশ কনসার্ভেটিভ ছিলেন নানা ব্যাপারেই। নো-ম্যাচ ফর মেজমামা! তা বলে ভেবো না বাগবাজারের সব লোকই কনসার্ভেটিভ। তবে মেজমামীমা একেবারেই মান্ধাতার আমলের...

থাক থাক যে মানুষ চলে গেছেন। তাঁর নিন্দা করতে নেই।

রান্নাঘরে যেতে যেতে নলিনীর মুখটি প্রসন্নতায় ভরে গেলো। একজন অন্য রকম মানুষ, তাঁর স্বপ্নের মানুষ এ বাড়িতে এসেছেন বলেই তো বটেই; তার চেয়েও খুশি হয়েছিলেন বেশি গিগির ঐ শেষ কথাটিতে। যে-কথা তিরিশ বছর শ্বশুরবাড়ির জীবনযাপন করেও তিনি কোনোদিনও অন্তর থেকে বলতে পারতেন না, তাঁর আলট্রা-মডার্ন ট্যাঙস-ট্যাঙস্ কথা বলা, হুইস্কি খাওয়া, ছেলে বন্ধু-ওয়ালা পুত্রবধূ কেমন অবলীলায় সেই কথাটাই বলে দিলো? "তুমিই আমার অনেক বেশি আপন আমার বাপের বাড়ির লোকদের চেয়ে। আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।" কার মধ্যে যে কি থাকে সহজে জানা যায় না।

কচুরির পুরের মধ্যে আলাদা কাঁচালঙ্কা-বাটা মেশাতে মেশাতে নলিনী ভাবছিলেন আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা নিউক্লিয়ার বোমা নয়। তা হচ্ছে একে অন্যকে না-বোঝার সমস্যা। ল্যাক অফ কম্যুনিকেশন। গিগিকে উনি কখনও পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি ওর অতি আধুনিকতার জন্যে। ভূঙটা যে একটা ভেড়া। গিগির অপরূপ রূপেই ও মজে গেছে, মজে গেছে বম্বেওয়ালির আধুনিকতায়। সত্যিই ভেড়ার মতোই আচরণ করে। আজ গিগির মেজমামা না এলে, গিগিকে এমন করে জানা সম্ভব হতো না হয়তো। জয়েন্ট ফ্যামিলি পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্কের যথার্থ পটভূমি ছিলো। কালো পর্দা। যার সামনে পাত্র-পাত্রীরা দাঁড়াতো, কথা বলতো। তা ছিঁড়ে যাওয়াতে, ঐ পটভূমিটিই খসে পড়াতে; মঞ্চটিও অপসারিত হওয়াতে, কারো সঙ্গে কারোই আর সমঝোতা নেই, বোঝে না কেউই একে অন্যকে, যা একজন বলে অন্যেকে, তা চেঁচিয়ে বললেও ভুল বোঝাবুঝির হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই সব কথা। পৌঁছয় না; যেখানে পৌঁছনোর। এই ছোট্ট ঘরের ছোট্ট সুখের দু-জন-আড়াইজনের বড়ই নেংটা। আড়ালহীন। গোপনীয়তা, রাখ-ঢাক, সমঝোতা নিয়ে জীবনে বাঁচারও একটা মস্ত বড় ভূমিকা ছিলো এক সময় মানুষের জীবনে তাঁদের সময়ে। মজাও।

পুর ভরে, দ্রুত হাতে কচুরি বেলে, কড়াইতে কচুরি ছেড়ে দিয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন নলিনী। কচুরি আস্তে আস্তে ফুলতে লাগলো; লাল হতে লাগলো। গ্যাসের আঁচে নলিনীর ফর্সা গালেও একটু লালের আভা লাগলো।

সেই লালিমা শুধু গ্যাসের আগুনেরই?

তাড়াতাড়ি কচুরি প্লেটে তুলে, আলু-কুমড়ো আর ছোলার ছক্কার পাত্রটিও হাতে তুলে ডাকলেন, বাটুমা!

নিচু গলায়।

পাশের খাবার ঘর থেকে গমগম গলাতে শুভাশিস বলে উঠলেন: কই রে? তোর মা কই রে? আঁ? সে কী? না, মা! সক্কলে একসঙ্গে বসবো। নইলে খাবোই না। এসব কী সেকেলের ব্যাপার!

নলিনী বাইরে এসে বললেন, আচ্ছা, কারো তো ভাজতে হবে এগুলো। আপনি বড় অবুঝ।

শুভাশিস নলিনীর মুখের দিকে এক মুহূর্ত এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন।

একটু চুপ করে থেকে মুখ নামিয়ে নিলেন। একটু পর মুখ তুলে বললেন অবুঝ হয়তো তাইই। আমার স্ত্রী সীমাও সব সময় এই কথাই বলতো বটে। ঠিক আছে। বেয়ান যা আজ্ঞা

করবেন তাই হবে গিগি। এসো ভুণ্ড। শুরু করো তোমরা আমার সঙ্গে। আজ একেবারে কব্জি ডুবিয়ে খাবো।

তুমি যে ফ্লরীর কেক আনলে এতগুলো, খাবে না এখন ?

গিগি শুধলো।

ধ্যুৎ ! ওসব আমি খাবো না। ওগুলো মফঃস্বলের লোকদের জন্যে। এখানে তো ভালো কেক পাস না তোরা !

তারপর কড়াইশুঁটির কচুরি মুখে দিয়েই বললেন, বাঃ। বাঃ। ঠিক এমনই কচুরি করতেন আমার মা। কী চমৎকার স্বাদ। আর তেমনই হয়েছে ছক্কাটা। ক্যাটারারদের দয়ায় এসব খাওয়া তো দেশ থেকে উঠেই গেছে। বাড়ির লোকেরা রাঁধে না। তার ওপর এখন তো উইডোয়ারের সংসার।

রাঁধে কে ? তোমার খাওয়া দাওয়া ?

গিগি শুধোলো।

তিরিশ বছরের পুরোনো লোক। আমাদের গণেশ। সীমা থাকতে বুঝতে পারি নি যে গণেশের সিদ্ধি আসলে সীমারই। সে হতচ্ছাড়ার সীমিত ক্ষমতাকে অসীম করে তুললো সীমাই, তার নিজেরই গুণে। এখন হারামজাদা কোনো রকমে নাড়ে-চারে। একদিন পটল ভাজার সঙ্গে চারটে তেলাপোকাও ভেজে দিয়েছিলো মাসখানেক আগে। চোখেও এখন কম দেখে বেশ। বয়সও আমারই মতো হলো। চশমা বানিয়ে দিয়েছি। যখন জামা-কাপড় পড়ে হাতে ঘড়ি বেঁধে রান্না করে তখন দেখলে মনে হয় নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর কোনো ভারিক্কি প্রফেসর মনোযোগ দিয়ে আলু-পোস্ত রান্না করছেন। অবশ্য প্রফেসাররা রান্না করলে সে রান্নার স্বাদ যা হতো আমার সিদ্ধিদাতা গণেশের রান্নার স্বাদও তথৈবচই। আসলে, নামেও ওর গণ্ডগোল। রোজই সকাল সন্ধ্যে সিদ্ধির গুলি খায় ব্যাটা। ওর নাম হওয়া উচিত ছিলো সিদ্ধি-গ্রহীতা, সিদ্ধিদাতা নয়।

কেতুদিরা কেমন আছে মেজমামা ? একবার ওঁদের নাচের গ্রুপের সঙ্গে ও এসেছিলো বম্বেতে। চণ্ডালিকা করতে। আমি তখন বম্বেতেই ছিলাম। ওঁর স্বামী রাহুলদা কিন্তু ভারী ভালোমানুষ।

তা ঠিক। শুভাশিসবাবু বললেন। রাহুল থেকে ল'টা বাদ দিলে যেমন ভালো হয় তেমন আর কী। আইডিয়াল ম্যাচ। রাহুর সঙ্গে কেতুর।

গিগি আর ভুণ্ড হো হো করে হেসে উঠলো।

গিগি বললো, সত্যি ! তুমি না ! নিজের জামাই মেয়েকে এমন করে কেউ বলে ?

শুভাশিস চেঁচিয়ে উঠলেন, কই বেয়ান ? এখনও আপনার আসার সময় হলো না ?

নলিনী এবার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে এলেন। এসে চেয়ারটাতে বসলেন। তাকালেন শুভাশিসের দিকে। ঐ চেয়ারটিতে জ্যোতিষই বসতেন। সব সময়ই। কোনোদিনও খাওয়ার টেবলে অন্য চেয়ারে বসেননি। প্রত্যেক বাড়ির খাওয়ার টেবলেই এক একজন মানুষের এক একটি চেয়ার নির্ধারিত থাকেই। তিনি বাইরে গেলে অথবা একেবারেই চলে গেলে চেয়ারটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। তবে কিছুদিন। তার পরই চোখে সয়ে যায়। বিশেষ কেউ যে সেখানে বসতেন সে কথা আর মনে পর্যন্ত পড়ে না কারোই। শুভাশিস জ্যোতিষের চেয়ারটিতে বসতেই হঠাৎ জ্যোতিষের কথা মনে পড়ে গেলো।

জ্যোতিষ ছিলেন মাঝারী উচ্চতার রোগা-পাতলা, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে প্রকৃতির মানুষ। একদিনও রাতে তিনটের চেয়ে বেশি একটিও রুটি খাননি। না। একদিনও নয়। কোন্ দিন কী খাবেন তার ছকও বাঁধা থাকতো। মেনু দেখে এ বাড়ির সকলেই বলতে পারতো সেদিনটা কোন দিন। মঙ্গলবার নিরামিষ। সোমবার আর বৃহস্পতিবার মাছ। বুধবার মাটন। শনিবারে চিকেন। রবিবারে রাতে খিচুরী, দিনে সেদ্ধভাত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা। তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। কর্তার হুকুমে। কোনো রকম ব্যতিক্রমের বৈচিত্র্য বা আনন্দ অজানাই ছিলো এ বাড়িতে। সপ্তাহের কোনদিন আদর করবেন নলিনীকে তাও বিয়ের দু বছর পর থেকেই পূর্ব নির্ধারিত ছিলো। মানুষটার আদরটাকেও মনে হতো আর্মির ডিসিপ্লিনড রেজিমেন্টের কুচকাওয়াজ। তাই-ই জ্যোতিষের পরিপ্রেক্ষিতে এই মানুষটিকে একেবারে অন্য রকম লাগছে। বে-হিসেবের বে-নিয়মের। এই সাবধানে গুছিয়ে রাখা নলিনীর জীবনটার উপরে একেবারে দামাল উথাল-পাতাল ঝোড়ো হাওয়ারই মতো এসে আছড়ে পড়েছেন শুভাশিস।

শুভাশিস বললেন, কই রে ! আঁচার-ফাঁচার নেই গিগি ? বের কর্ না। তোরা কি করে ?

তেল-টেল, মশলা ; অমন সব অয়লী ব্যাপার তোমার কি খাওয়া উচিত মেজমামা ? তোমার না একটা অ্যাটাক ...

গিগি বললো।

থামতো। জীবনে উচিত কম্ম আর ক'টাই বা করেছি ? এখন আঁচারের বেলায় ঔচিত্যের প্রশ্ন না হয় নাই-ই ওঠালি।

গিগি অসহায়ের মতো এদিক ওদিক চাইছিলো। নলিনী সবে চেয়ারে বসেছিলেন। উঠে পড়ে ভাঁড়ারের দিকে গেলেন আঁচারের খোঁজে।

শুভাশিস বুঝলেন যে, তাঁর বোনঝি গিগি এই সংসারের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখে না। সবই নলিনীর উপরে।

আঁচার নিয়ে এলেন আলাদা আলাদা প্লেটে করে নলিনী। তেঁতুলের। আমের। এবং লেবুরও।

গিগি বললো, বলো মেজমামা ? কোন্‌টা খাবে ?

কোনটা মানে ? সবটাই খাবো। মানে সব রকমই।

নলিনী কৌতূকভরে তাকালেন লম্বা-চওড়া মাথা-ভরা কাঁচা-পাকা চুলের ছেলেমানুষটার দিকে। শিশুর মতোই হাব-ভাব। জীবনের প্রতি এখনও প্রচণ্ড আকর্ষণ ভালোবাসা আছে মানুষটার। ঔৎসুক্য, ছটফট করছে দুটি এখনও উজ্জ্বল কালো চোখে। ভাবলেন, ছোটো-খাটো ব্যাপার দিয়েই মানুষটাকে কিছুটা বোঝা যায়। বেশ মানুষটি ! বিভিন্ন স্বাদের সামান্য এই আঁচার খাওয়ার ব্যাপারটাও জীবনের প্রতি এখনও তাঁর তীব্র ভালোবাসাকেই স্পষ্ট করেই ফুটিয়ে তোলে। জীবনের আরেক নাম আঁচার। জ্যোতিষ তা কখনও জানেননি। কাউকে জানানওনি।

আসুন। এবার বসুন বেয়ান। ভৃগু ! এ কী জামাই ! তোমার যে দেখছি, একেবারে পাখির আহার ! এটুকু খেয়ে ব্যাঙ্কের অত ঝামেলার সব কাজ করো কি করে ? তোমাদের ব্যাঙ্কের কাজ, চোখে দেখলেও তো আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। যতোই করো, ভালো কেউই বলবে না, শুধুই সমালোচনা। থ্যাঙ্কলেস্ জব্ তোমাদের বাবা।

-- সত্যিই। ভৃগু বলল। খুশি হয়ে। ভাবলো, কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে বলতে হবে সবাইকে।

আমরা থাকতে তুমি এখানে জ্যাক্‌সন্ হোটেলে ওঠার কথা ভাবলে কী করে ? মেজমামা ?

ভৃগু বললো, শুভাশিসকে, অনুযোগের স্বরে।

গিগিও বলল, যা বলেছো। শুভাশিসের প্লেটে কচুরি তুলে দিতে দিতে।

ওঃ। আগের চিঠির কথা বলছিস কি তোরা ?

নলিনী তাকালেন ওদের দিকে, আগের কথা শুনে অবাক হয়ে।

আসলে কী জানিস ? প্রত্যেক বাড়ির নিজস্ব কতগুলো নিয়ম থাকেই। এতোটার সময় ওঠো, এতোটার সময় বেড-টী, এতোটায় ব্রেকফাস্ট এবং তার আগে আবার চান করে নিতে হবে, কারণ গীজার এতোটা অবধি চলে। অথবা জমাদার আসবে এতোটার সময় বাথরুম পরিস্কার করতে। এতোটায় লাঞ্চ। এতোটায় আফটার-নুন টী। এতোটায় ডিনার। যে যাইই বলুক, নিয়ম থাকে সব বাড়িতেই। এবং প্রত্যেক বাড়ির নিয়মই আলাদা। আলাদা। তার উপর আমি হচ্ছি গিয়ে রিটায়ার্ড, বাউণ্ডুলে-বৌ-মরে-যাওয়া লোক। কিসের জন্য তোদের বাড়িতে থেকে তোদের নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর হামলা করি বল ? এই সব কারণেই সব জায়গাতেই আমি হোটেলে থাকাই পছন্দ করি। যতদিন সামর্থ্য ছিলো বম্বে-দিল্লী-মাদ্রাসেও ফাইভ-স্টার হোটেলেই থেকেছি। তাতে অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি নেমন্তন্ন খাওয়া বা আড্ডা মারার ব্যাঘাত ঘটেনি কোনো। কিন্তু এখানকার থাকার মতো রেস্ত এখন্ত আছে। তাই-ই ভেবেছিলাম, হোটেলেই উঠি। বেশি কাছাকাছি থাকা ভালোও নয়, বুঝলি না ! ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রীডস কনটেম্পট।

নলিনী এবারে সত্যিই অবাক হলেন। এ-ব্যাপরে কিছুই জানতেন না। আগের চিঠির কথা।

গিগি নলিনীর কৌতূহল লক্ষ্য করে, ওঁকে বললো, হ্যাঁ মা। মেজমামা আগেই আমাকে লিখেছিলেন যে, জ্যাকসন হোটেলে উঠবেন, আ-ছেন এখানে ক'দিনের জন্যে। তখন ওর সঙ্গে পরামর্শ করে আমিই লিখেছিলাম যে, তার কী দরকার ! দু-দুটো গেস্ট-রুম আছে। তবে,

বাড়ির ও আমাদের মালিক তো তুমিই। তাই মেজমামাকে লিখেছিলাম, তোমাকেই লিখতে। বলেছিলাম, তুমি তাঁকেই লেখো। মালকিন যে তিনিই!

ছিঃ।

নলিনী আহত এবং লজ্জিত গলায় বললেন বৌমা মিথ্যে বললো। ডাহা মিথ্যে। তবুও মিথ্যে কথাও যে শুনতে এতো ভালো লাগে তা জেনে অবাক হলেন। বাড়ির মালিক যে তিনি নন তা তিনি জানেন।

শুভাশিসকে কী যেন বলতে গিয়েও, থেমে গেলেন। শুভাশিসের মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিলেন নলিনী।

নলিনীর হঠাৎই মনে হলো মানুষটি জাল মানুষ। অত সুন্দর করে যারা কথা বলে তাদের কথার দাম থাকে না আসলে কিছুই। গিগির নির্দেশেই তাহলে চিঠিটি লিখেছিলেন। কত ইনিয়ে-বিনিয়ে, কাব্যি করে।

বাইরে বিকেল মরে এলো। পথের পাশের মস্ত মস্ত মেহগনী গাছগুলোতে নানান পাখি কিচিরমিচির করছে। সন্ধ্যে হয়ে যাবে একটু পরই। নলিনীর মনে শুভাশিসের চিঠিটি পাওয়ার পর থেকেই যে উম্মনা উদ্বেল ভাবের সৃষ্টি হয়েছিলো, যাকে তিনি এক'দিন বড় যতনে মনের মধ্যে লালন করেছিলেন, তাও এই বিকেলেরই মতো মরে গেলো। তাঁর বুকের মধ্যের সব কল্পনা, প্রত্যাশা উনুন থেকে হঠাৎ নাবিয়ে-নেওয়া ফুটন্ত-দুধের পাত্রর মধ্যের দুধ যেমন বিড় বিড় করে তার উচ্ছলতার উপরে সর ফেলতে ফেলতে ঘুমিয়ে পড়ে, তেমন করেই ঘুমিয়ে পড়লো মরা বিকেলে। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট বোধ করলেন তিনি। ঠিক এই ধরনের কষ্টর সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিলো না আগে।

ভালোই হলো। ভগবান যা করেন তা ভালোর জন্যই। নলিনীর এই হঠাৎ-খুশি, হঠাৎ-উত্তেজনা বাঞ্ছনীয় তো ছিল না। সমাজের অনুমোদনও পেতো না এই বোবা বোধ।

ভালোই হলো।

যা-কিছু ঘটে, তা ভালোর জন্যেই।

॥ ২ ॥

যা কিছুই ঘটে সবই ভালোর জন্যেই। বুঝলেন বেয়ান।

শুভাশিস বললেন।

একটি সাদা পায়জামা আর হালকা নীল-হাতে-বোনা খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে রান্নাঘরের দরজার সামনে মোড়া-পেতে বসে নলিনীকে আলু কেটে দিচ্ছিলেন উনি ছুরি দিয়ে। আর গল্প করছিলেন।

নলিনী রান্নাঘরের মধ্যে একটু উঁচু টুলে বসে রান্না করছিলেন। চান করেছেন অনেকক্ষণই। তবু, এখনও ভেজা চুল তাঁর পিঠময় ছড়ানো। চুলের তেলের গন্ধ ভূরভূর করছে রান্নাঘরে। সীমা মাখতেন জবাকুসুম। নাম-না-জানা নতুন কোনো তেলের স্নিগ্ধ গন্ধে শুভাশিসের নাকে নলিনীকে স্নিগ্ধতর মনে হচ্ছে। সীমার গন্ধও সুন্দর ছিলো। কিন্তু নলিনীর অন্যরকম। প্রত্যেক নারীর গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ আলাদা আলাদা।

দরজার সামনে বসা শুভাশিস নলিনীর মুখটি দেখতে পাচ্ছিলেন। প্রোফাইল। ডান পাশ থেকে মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিলেন সেই মুখে তিনি। কেন জানেন না, সম্পূর্ণ বিনা কারণেই নিজেকে চোর চোর লাগছিলো। এই চোর-চোর ভাবটা তাঁকে ভিতরে ভিতরে বেশ অপরাধীও করে তুলেছিলো। এমন বিনা-অপরাধের অপরাধ বোধ এতদিন পর্যন্ত অজানাই ছিলো তাঁর কাছে।

আপনি মাছ-মাংস খান না, সে কথা আগে জানলে এতোরকম মাছ আনতামই না বাজার থেকে।

শুভাশিস বললেন নলিনীকে।

আমি একাই তো খাই না। ওরা তো সকলেই খাবে। আপনিও তো ভালোবাসেন খেতে। তবু নষ্ট হবে অনেকই। আপনার কোনো আন্দাজ নেই।

তা নেই। স্বীকার করি। শুধু মাছের বেলাই কেন, কোনো ব্যাপারেই আমার আন্দাজ নেই।

উনি, মানে, আমার স্বামী কিন্তু এমন অপচয় একেবারেই পছন্দ করতেন না। এতো মাছ এবং এতো রকম, এই ক'জনে খাবে কি করে তাতো ভেবে পাচ্ছি না আমি। ফ্রিজে রাখলে, মাছের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

নষ্ট হবে কেন ? ঐ পাশের বাড়ির শ্রাবণীদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন না হয় বেশি হলে। অপচয়ের কি আছে বেয়ান ? জীবনে অপচয় কিছুমাত্রই হয় না। সঞ্চয় অথবা অপচয় এই দুয়ের কোনোটাই আমাদের নিজেদের হাতে নেই। মাছ অপচয় করা যেতে পারে, পয়সাও সঞ্চয় করা যেতে পারে ; কিন্তু এগুলো ঠিক মানবিক দোষ-গুণের মধ্যে পড়ে কি ?

অতো আমি জানি না।

নলিনী বেয়ান, মাছ আপনি খাবেন নাইই বা কেন ?

আমি তো একা নই। অনেকেইতো খান না বিধবা হলে। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?

এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমারও তো স্ত্রী নেই অথচ আমি তো সবই খাই। পৃথিবীর কোন্ সভ্য দেশে এমন উদ্ভট নিয়ম আছে বলুন তো ? তাছাড়া, মেয়েদের বেলাতে এক নিয়ম আর ছেলেদের বেলাতে অন্য; এটাই বা কেমন কথা !

তা জানি না। তবে হওয়ার কথা সেরকমই। দেশটা তো পুরুষশাসিতই ! তাছাড়া যখনই কোনো নিয়ম গড়ে ওঠে, সে নিয়ম ধর্মীয় হোক কী সামাজিক হোক, তার পেছনে কারণ নিশ্চয়ই কিছু থাকেই। ছিলো অন্ততঃ যখন নিয়ম গড়ে উঠেছিলো।

কী কারণ ? আমি তো বুঝি না। মেয়েদের স্বামী মরে গেলেই মাছ-মাংস ছাড়তে হবে এমন নিয়মের মানেটা কি ?

তা আমি বলব কী করে ? তবে বিধবাদের উত্তেজক জিনিস-টিনিস খেতে মানা করে সমাজ তো ভালোই করেছে বলে মনে হয় আমার।

বাঃ। বাঃ।

হেসে উঠলেন শুভাশিস।

ভালোই বলেছেন আপনি। মেয়েদেরই উত্তেজি হওয়াটা ভয়ের আর পুরুষদের বেলা ভয়ের নয় ? এর মানে কিছুই বুঝি না। তাছাড়া চারিত্রিক দোষ ঘটাতে তো যে-কোনো নারীরই নিদেনপক্ষে একজন পুরুষকেও দরকার সঙ্গী হিসেবে ? না কি ? আপনি শিক্ষিতা, আপনার এসব মান্ধাতার আমলের নিয়ম-কানুন নিয়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কলকাতায় এসব তো উঠেই গেছে বলতে গেলে। তাছাড়া ঝকমারীও কি কম ? আলাদা রান্না, আলাদা বন্দোবস্ত আলাদা বাসন।

না, না, আমার সেসব কোনো বাড়াবাড়ি ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারই নেই। নিরামিষ খাই, একই। ছেলে-বৌ তো সবসময়েও বলে আমাকে। তবে, নিয়ম অনেকদিন ধরে মানে প্রজন্মর পর প্রজন্ম মানতে থাকলে নিয়মটা বোধ হয় হাড়ে মজ্জাতে ঢুকেও যায় তা বোধ হয় বোঝা পর্যন্ত যায় না। আমাদের মা-ঠাকুমাদেরও তো এই নিয়মই মানতে দেখেছি। নিয়ম ভাঙা হয়তো সহজ বেয়াইমশাই ; সংস্কার ভাঙা অত সহজ নয়।

বাঃ। আপনি তো চমৎকার বললেন, আর বাংলাও তো দারুণ বলেন। কে বলবে যে, আপনি ভোপালে আর জব্বলপুরেই জীবন কাটিয়েছেন।

নলিনী হেসে ফেললেন। বললেন, বাঃ আমি ত বাঙালীই ! তাছাড়া আপনি কি ভাবছেন যতকিছু ভালোত্ব সব আপনার একারই কুক্ষিগত করে রাখবেন ?

হাসলেন আবার শুভাশিস। শেষের কথাটিতে একটু চমক্ও লাগলো। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন উনি নলিনীর দিকে। নলিনী চোখ নামিয়ে নিলেন চোখে চোখ পড়তেই। আগেও তাইই করেছেন। লক্ষ্য করেছেন শুভাশিস।

শুভাশিসেরও সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সীমা চলে যাওয়ার পর এই কটা বছরের জীবনের একঘেয়েমিতে বিপত্নীকের জীবন সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা গড়ে নিয়েছিলেন। জীবনের অনেকই বোধের এবং অনুভবের ঘরে তাঁর আর কোনো দবী দাওয়া নেই যে, তাও মেনেই নিয়েছিলো। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরের জানালার দাক্ষিণ্যে রান্নাঘরের নরম কমলা আলোর আভাসে আভাসিত হয়ে আছে। আদা-জিরে বেটে রেখে গেছে রান্নাঘরের এক কোণে বাটুমা। পাবদা মাছের ঝোলে লাগবে। বড় বড় পাবদা মাছ এনেছেন শুভাশিস মসুরের ডালে লঙ্কা আর কালো-জিরো সম্বার

দেওয়ার গন্ধর সঙ্গে নলিনীর পেছনে দই দিয়ে মেখে-রাখা পাঠার মাংসর গন্ধ নালনীর চুলের তেলের গন্ধর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সমস্ত রান্নাঘর এক মিশ্র-গন্ধে ভুর ভুর করছে। বেশ লাগছে শুভাশিসের। ছেলেবেলায় রান্না করতেন মায়ের পিঠের উপর দিয়ে ঝুঁকে দেখতেন তিনি। তাঁর স্ত্রী সীমা এসব ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখলেই শুভাশিসকে বলেছেন : "মেয়েলিপনা কোরো না তো! এরকম মেয়েলি পুরুষ আমি দুচোখে দেখতে পারি না।"

সীমা হয়তো ঠিকই বলতেন। কে জানে? তবে এখন শুভাশিস তো আর পুরুষ নন। পুরুষমানুষ রিটায়ার করলে তার অবস্থা বড়ই করুণ হয়ে যায়। তিনি তখন না-পুরুষ, না-নারী! তাকে পূর্ণ পুরুষ বলে গণ্যই করতে চায় না কেউই, ঘরে কী বাইরে।

যদিও এখনও কার্তিকের মাস, রান্নাঘরের তাপে নলিনীর দৃপ্ত কিন্তু মিষ্টি, ফর্সা চিবুকে মুক্তোর মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। দেখে, হঠাৎ খুবই কষ্ট হলো শুভাশিসের।

বললেন, এ কী বেয়ান! আপনি যে ঘেমে গেছেন! এই সময়েই এমন, তো এই রান্নাঘরে গরমের সময় কী অবস্থা হয় তাতো ভাবতেই পারছি না।

হাসালেন আপনি। আমি বেশি ঘামি। রান্নাঘরের দোষ নয়, দোষটা আমার।

নলিনী বললেন।

তারপর বললেন, রান্নাঘরে একটু তো হয়ই!

মোটেই না। এগজস্ট ফ্যান লাগিয়ে দিলেই অনেকেই কমে যাবে ধুঁয়ো তো হবেই না দাড়ান। আজ বিকেলেই আমি কিনে আনছি একটা।

পাগল নাকি আপনি? তিরিশ বছরের বেশি কেটে গেলো আমার এই রান্নাঘরেই। ভৃগু আর গিগি শুনলে হাসাহাসি করবে যে!

করলে করবে। আমি আজই যদি না আনি তো কী বলেছি।

সত্যিই পাগল আপনি। করবেন না অমন পাগলামো।

সে দেখা যাবে।

না না!

রীতিমত ভীত দেখালো নলিনীকে। ভয়ার্ত শোনালো গলার স্বরও। বললেন, আমি সীরিয়াসলী বলছি কিন্তু বেয়াই। করবেন না ওরকম।

বলেই ডালটা নামালেন গ্যাসের উনুন থেকে।

শুভাশিস প্রসঙ্গ বদলে বললেন, এখন কি চাপবে?

আপনার পাবদা মাছের ঝোল। এখানের পাবদা এবং অন্যান্য মাছ সত্যিই ভালো। তাছাড়া কলকাতার তুলনায় তো অনেকেই সস্তা, তাই না?

অনেক, অনেক।

বলেই, শুভাশিস বললেন, এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে খুব। পাওয়া যাবে কি? তবে আপনারও খেতে হবে কিন্তু। একা খাবো না। স্বার্থপর লাগে।

নলিনী বললেন আমি খাবো না। আপনাকেই করে দিচ্ছি। অসময়ে আমি--

আপনি না খেলে আমিও খাবো না। তা হলে থাক। করতে হবে না।

শুভাশিস বললেন। ছেলেমানুষের মতো।

হেসে ফেললেন নলিনী। বললেন, সত্যি! এ আপনার ভারী অন্যায় কিন্তু।

শুভাশিস মুখ নিচু করে যেন নিজের মনেই বললেন, জীবনে ন্যায় তো খুব বেশি করিনি বেয়ান। অনেকেই বড় বড় অন্যায় করেছি। না-হয় এই ছোট্ট একটি অন্যায় করলামই।

আমি অসময়ে যে কিছুই করিনি কখনও। মানে, অনিয়ম আর কী? আপনার বেয়াই জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন ঘর করে এই রকমই অভ্যেস হয়ে গেছে।

বলেন কী! হঠাৎ অসময়ে চা খেতে, বা বৃষ্টি পড়লে হঠাৎ খিচুড়ি খেতে কখনও ইচ্ছে করেনি আপনার? জ্যোতিষবাবুরও? মাঝে-মাঝে নিয়ম না ভাঙলে নিয়ম বড়ই বেশি করে পেয়ে বসে নাকি মানুষকে? অতটা মানা কি ভালো? জানি না।

আমিও জানি না তবে নিয়ম ভাঙিনি কখনও এটুকুই বলতে পারি। একটা সময় ছিলো, যখন অনেকরকম নিয়ম ভাঙবার ইচ্ছে থাকলেও কোনো নিয়মই ভাঙতে পারিনি। আর আজকে ইচ্ছেটাই মরে গেছে।

ম্লান হেসে, বললেন নলিনী। হাসিতে কেন যে ম্লানিমা লাগলো নিজেই বুঝতে পারলো না।

মুখে বললেন, ঐটুকুই ! কিন্তু মনে মনে বললেন, জ্যোতিষ রায়ের জীবনে, সাম্রাজ্যে, অনিয়ম বলে কিছুমাত্র ছিলো না। তাঁর নিয়ম তিনি জাহির করেননি, স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেননি কখনও। কিন্তু সেই অলিখিত, নিরুচ্চারিত নিয়মগুলি ভাঙার জো পর্যন্ত ছিল না কোনো।

বাটুমা, না কী যে নাম ওর ?

হঠাৎই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে শুধোলেন শুভাশিস।

কি বেয়ান ? গেলো কোথায় ছেলেটা বলুন তো সিগারেটের খোঁজে ? আমার ব্রাণ্ডটাও অবশ্য একটু উড়ুট। পাচ্ছে না বোধ হয় কাছাকাছি।

নলিনী নিচু গলায় বললেন, এসে যাবে। জব্বলপুরের এই দিকটা ফাঁকা তো। দোকান-বাজার সবই একটু দূরে দূরে।

নলিনীর এই নরম কোমল গাম্ভীর্যে বাঁধা স্বভাবটি ভারী ভালো লেগেছিলো শুভাশিসের। সীমা সৎ, আন্তরিক, সচ্চরিত্র ছিলেন মানুষ হিসেবে। কিন্তু তাঁর স্বভাবটি ছিল তারার তীব্র সুরে বাঁধা। প্রত্যেক নারীর সঙ্গে অন্য নারীর প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে অন্য পুরুষের কত্ব তফাৎ থাকে। এতবছর যেন তা জানতেন না ! নিজের এই মূর্খামির জন্যেও নিজেকে ভালো লাগতে লাগলো ওঁর।

এখন বাড়িতে কেউ নেই। গিগি এবং ভৃগু অফিসে। টুটু স্কুলে। বাটুমা সিগারেটের খোঁজে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে এখন এক একা-নারী এবং একজন একা-পুরুষ। পর পুরুষ। পরস্ত্রী। ভাবতেই, কীরকম যেন লাগছিল নলিনীর। তাঁর জীবনে ঠিক এইরকম অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। এই একাকী, মানুষ দুটির বোধহয় দুজনকেই ভালো লেগে গেছে দুজনের। দুজনের মধ্যেই দুজনে অতি অল্প-সময়ের মধ্যেই এক নতুন জগৎকে আবিষ্কার করেছেন, যে-জগৎ তাঁদের নিজের-নিজের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের জগৎ থেকে অনেকই আলাদা। যা-কিছু এতোদিন জানা ছিলো, নিজের অভিজ্ঞতার বৃত্তর মধ্যে যে জানাগুলি কুণ্ডলী পাকানো নির্বিষ সাপেরই মতো শুয়ে ছিলো নির্জীব হয়ে, তাদেরই ধ্রুব বলে জেনেছিলেন। দুজনেই। অন্যরকম যে হয়, হতে পারে ; জীবনের এই দূরত্ব পৌঁছেও তা ভেবেই মন হঠাৎই বড় খারাপ লাগে।

শুভাশিসের মনে কি হচ্ছে তা তিনি জানেন না, কিন্তু নলিনীর মনে অন্যরকম অনুভূতি জাগছে। এই সব অননুভূত অনুভূতির সঙ্গে নলিনী আগে পরিচিত ছিলেন না।

নলিনী ভাবছিলেন, তাঁরা দুজনে কি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছেন ? বুড়ো না হলে, তাঁদের নিয়ে কারোই দুর্ভাবনা নেই কেন এতটুকুও ? সবরকম বিপদের এলাকাই কি তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন ? এমনকি কাজের যে লোকটি সেই বাটুমারও নয় ? বুড়ো হওয়া যে এতোই অপমানের, আগে কিন্তু একদিনের জন্যেও এমন করে বুঝতে পারেননি। ঔদাসীন্যের মতো এতো বড় অপমান বোধহয় আর হয় না। তাঁদের সঙ্গে যুবক-যুবতীদের অনেক তফাৎ হয়ে গেছে।

কি ভাবছেন বেয়ান ?

কই ? কিছু না তো ?

চমকে উঠে বললেন নলিনী। লজ্জাও পেলেন একটু। শুভাশিস মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর হঠাৎ লজ্জা-পাওয়া মুখে চেয়ে রইলেন।

ভাবছেন কিছু। স্পষ্টই বুঝতে পারছি। শুভাশিস বললেন।

ভাবলেই বা কি ?

জানেন, আমিও খুব ভাবি। আমার হওয়া উচিত ছিলো কবি। কিন্তু বাবার আজ্ঞায় হতে হলো উকীল। আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই যা হতে চেয়েছিলাম তা হতে পেরেছি, আমাদের জেনারেশনের মানুষদের কথা বলছি, তাই না ? অথচ এই না-চাওয়া জীবন আঁকড়েই জীবনের দৈর্ঘ্য মাড়িয়ে গিয়ে শেষের ফিতেতে বুক ছোঁওয়ালাম। ফার্স্ট হলাম, কেউ লাস্ট। কী দুঃখের ! না ?

নলিনী মুখে কিছু না বলে, মুখ এদিকে করে একবার তাকালেন শুভাশিসের মুখে। তারপর ফিরিয়ে নিলেন মুখ।

ভাবনা দেখা যায় না। দেখা গেলে বেশ হতো তাই না ?

কে বলতে পারে ? কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো এমন কোনো ইলেকট্রনিক গ্যাজেট আবিষ্কার হবে, টি ভিরই মতো ; যাতে মানুষের ভাবনাও ফুটে উঠবে পর্দাতে।

নলিনী বললেন।

তারপর বললেন, গোপন বা নিজস্ব বলতে আর থাকবে না কিছুমাত্রই। বিজ্ঞান কিন্তু আমাদের দিনে দিনে বড়ই নিঃস্ব করে তুলেছে। আপনার কি মনে হয় না এ কথা?

হয় বৈকি। সত্যিই! তবে যাইই বলুন, অমন দুর্দিন আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে যেন না আসে। কি বলেন? ভাবনাগুলোও যদি চুরি হয়ে যায় ...

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন দুজনেই।

আপনার তো একটা হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে। তবুও সিগারেট খান কেন অতো? বাণপ্রস্থর সময়ও তো হলো। এটা নইলে নয়, ওটা নইলে নয় এখন কি মানায়?

এখন নিবৃত্তির সময়। সিগারেট ছেড়ে দিতে পারেন না?

অতো কোথায়? দিনে তো মাত্র দু প্যাকেটই খাই।

কম হলো? কী দরকার? খাবার?

আরও বেশিদিন বেঁচে করবোটাই বা কি? সীমা তো চলে গেলো কেতুর বিয়ের পরই। একা বাড়িতে, আমার গণেশের ভরসাতেই তো থাকা। নামেই গণেশ! আসলে, সে ঈশ্বরের দারুণ সৃষ্টি। বহুবছর কাজ করছে আমার কাছে। আসলে, সে ঈশ্বরের এক দারুণ সৃষ্টি বহুবছর কাজ করছে আমার কাছে। এরকম অখণ্ড-ইন্ডিয়ট খণ্ডিত-ভারতে আর দুটি নেই। জানি না, ওর মালিকের সম্বন্ধেও বোধহয় গণেশ এইরকম কথাই বলে থাকে। ওর বন্ধুবান্ধবদের। তবে, মানুষটি নিপাট ভালো। ওর ওই একটি গুণেই সমস্ত দোষ ধুয়ে যায়।

সারা দিনই কি আমারই মতো বাড়িতেই থাকেন? আপনি?

নলিনী শুধোলেন।

ঠিক তা নয়। সকাল-বিকেল, মৃত্যুর ভয়ে অথবা পুত্রবধুর ভয়ে-ভীত বেশ কয়েকজন নড়বড়ে বৃদ্ধদের সঙ্গে মর্নিং-ওয়াক আর ইভিনিং-ওয়াক করি। মাঝে মাঝে অবশ্য ক্লাবেও যাই। ক্লাবে যেতেও আজকাল আর ভালো লাগে না। সেই একই মুখ, একই কথা, একই আলোচনা। তার উপরে আজকালকার ছিঁচকে ক্লাব-পলিটিক্স! "ক্লাব" ব্যাপারটিই তো নষ্ট হয়ে গেছে। ইংরেজদের কাছ থেকে একটি ভালো জিনিষ পেয়েছিলাম আমরা, অনেক ভালো জিনিষেরই মতোই এও রাখতে পারলাম না।

নলিনী ভাবলেন, একটু বেশি কথা বলার প্রবণতায় পেয়েছে ভদ্রলোককে। তাঁর চেয়েও তো বেশ কয়েকবছরের বড়। সেনাইল হয়ে যাবার আগে কি এমনই হয়?

যখন বাড়ি থাকেন, তখন কী করেন?

কী আর করব! বই পড়ি। গান শুনি। কখনও ভিডিওতে ছবি দেখি, কোনো ভালো ক্যাসেট পেলে। আমাদের সময়কার কোনো ছবির ক্যাসেট। রণাল্ড কলম্যান, ভিভিয়ান লে, ইনগ্রিড বার্গম্যান, প্রমথেশ বড়ুয়া, কাননদেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, সুনন্দা দেবী, ইত্যাদিদের ছবি। কোনো কোনোদিন বা হাওড়ার কদমতলায় চলে যাই গোপালবাবুর বাড়িতে। গান শুনতে। বালিতেও যাই মাঝে মাঝে, চণ্ডীবাবুর বাড়িতে।

ওঁরা কারা?

সে কী! টপ্পা গায়ক নিধুবাবু এবং কালিপদ পাঠক ছিলেন না! সেই কালিপদ পাঠকেরই ছাত্র সব এঁরা। পুরোনো গান, বিশেষ করে টপ্পার মণির খনি আছে যে এঁদের কাছে। এখন তো অনুপ জলোটা আর পঙ্কজ উধাসেদেরই দিন। এই সব গুণীদের ও সাধকদের কথা বাঙালীরা পর্যন্ত মনে রাখেনি। গোপাল চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস মাল এবং রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে বাংলার এক বিশেষ যুগই শেষ হয়ে যাবে যদি ঐসব গান কেউ যত্ন করে না রাখেন। আমার গলায় ভগবান যে সুর দেননি! দিলে, শুধু এই সব গানই গাইতাম।

নলিনী চুপ করে ছিলেন।

কি বেয়ান? নাম শোনেননি এঁদের? গান?

লজ্জিতমুখে নলিনী বললেন, আপনাদের বাংলা থেকে এতদূরে থাকি। কখনও শুনিনি কারো গানই এঁদের। তবে নিধুবাবুর নাম শুনেছি বাবার কাছে। রামনিধি গুপ্ত তো? দাশরথী রায়, গোপাল উড়িয়া, শীধর কথক ইত্যাদির নামও। কিন্তু এখানে বসে গান শুনবো কি করে?

ঠিক আছে। আমি কলকাতা ফিরে গিয়েই গোপালবাবু, রামকুমারবাবু আর চণ্ডীবাবুর গানের ক্যাসেট পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। রামকুমারবাবু আর চণ্ডীবাবুর তো এলপি রেকর্ডও আছে।

বলেই বললেন, রাজ্যেশ্বর মিত্রর নাম শুনেছেন ?

নাতো।

মহা পণ্ডিত লোক। এই ক্ষেত্রে। উনি কর্মজীবনে কাশীপুর গানসেল ফ্যাক্টরীতে ছিলেন। উনি নিধুবাবুর কিছু গানের স্বরলিপিও করেছেন। বই হয়ে বেরিয়েছে। তাতে গান বিকৃত হবে না ভবিষ্যতে ঠিকমতো গাওয়া হবে। এটাই আশা করা যায়। তবে রবিঠাকুরের গানেরই মতো নিধুবাবুর গানও শিক্ষিত গায়কদেরই জন্যে। স্বরলিপি দেখে হারমনিয়মের চাবি টিপে গান গাইলেই এই সব গান গাওয়া যায় না। আমার নিজের ধারণা যে কিছু কিছু গান থেকে যা হচ্ছে গুরুমুখী। গান তো গায় লক্ষ লোকেই বেয়ান, গানে প্রাণ ফোটাতে পারে কজন গায়ক-গায়িকা।

তারপরেই বললেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রাসাদের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি এসব আপনি শিখলেন কোথায় বেয়ান ?

আমার বাবার যে খুবই শখ ছিলো। ভোপালের বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন : সুরসিক। বাবা নিজেও ভালো গান গাইতেন। ছেলেবেলায় ক্ল্যাসিক্যালও শিখেছিলাম বছর পাঁচেক।

জ্যোতিষবাবুও কি গান গাইতেন ?

নাঃ।

সংক্ষিপ্তস্বরে বললেন নলিনী। আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

মনে মনে বললেন, গান তো, মানুষটির কাছে অপরাধ বিশেষই ছিলো। কিন্তু মৃত স্বামীর নিন্দা করা হবে ভেবে আর কিছুই না বলে থেমে গেলেন।

শুভাশিস একটুক্ষণ পরে নলিনীর মুখে চেয়ে থেকে মুখ নামিয়ে নিলেন।

বললেন, আপনার মতো গান কিন্তু খুব কম মানুষকেই গাইতে শুনেছি। সভা-সমিতি, রেডিও-টিভি'তে আজকাল এমন সব গায়ক-গায়িকাদের গাইতে শুনি যে কী আর বলব। আসলে কী জানেন ? সবই জাল হয়ে গেছে বেয়ান। জাল মানুষে আর জালিয়াতিতে ভরে গেছে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেত্রেই নির্গুনদেরই এখন জয়জয়াকার। মানে মানে, বিদায় নিলেই ভালো হয় এখন। আজকাল সত্যিই নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হয় আমার এখানে।

কথা ঘুরিয়ে নলিনী বললেন, আর কারো সঙ্গেই মেলা-মেশা করেন না আপনি ? সময় কাটে কি করে ? আমার না হয় ছেলে-বৌ-এর সংসার, নাতি, বাগান এত কিছু আছে ?

মনের মতো মানুষ না পেলে মানুষের সঙ্গে মেশার চেয়ে কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে মেশাও ভালো।

কোনো বন্ধুও কি নেই আপনার ?

নলিনী শুধোলেন।

হাসলেন শুভাশিস। বললেন, যে রকম বন্ধুত্বের কথা আপনি বলছেন তা করতে গেলে হাতে নষ্ট করার মতো প্রচুর সময়ের দরকার। তেমন কষ্ট করার মতো সময় আমার হাতে কোনোদিনও ছিলো না। স্কুল-কলেজের বন্ধু ছিলো কিছু। আজ তারাও নেই। আস্তে আস্তে খসে যাওয়া তারারই মতো আমার জীবন থেকে খসে গেছে। কেন যে খসে গেছে, সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না। সে সব বড়ই দুঃখের কথা, অপ্রিয় কথা ; সে সব আলোচনা না করাই ভালো। এই ষাট বছর বয়সে পৌঁছে এইটুকুই বুঝলাম বেয়ান যে, আজ অবধি আমাকে আমার নিজের কারণে, আমারই জন্যে ; একজন মানুষও ভালোবাসেনি। সত্যিই। একজনও নয়। এই জানাটা, বড়ই দুঃখময় জানা যে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যি। আলাপ-পরিচয়,স্বার্থের বিচ্ছিরি মরচে-পড়া লোহার উপর বন্ধুত্বর সোনার-জল-করা কিছু সম্পর্ক অবশ্য এখনও বেঁচে আছে। তবে, সোনার জল তো চিরদিনই লোহাকে সোনা করে রাখতে পারে না ! আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়েই। তাই-ই পড়েছে। এই সব প্রসঙ্গ থাক। বড় কষ্ট পাই।

অন্য কথা বলি তার চেয়ে আমরা।

এই নিন আপনার চা-টা।

কাপটা হাতে নিয়ে, এক চুমুক দিয়ে শুভাশিস বললেন, বাঃ ! চমৎকার।

পার্শে মাছ ভাজা খাবেন না কি একটা চায়ের সঙ্গে ?

নলিনী শুধোলেন।

না, না। পাগল নাকি আপনি ? সকালে যা খাইয়েছেন তাইই হজম হবে না দুপুরের খাওয়ার আগে। এতো আদর-যত্ন আমার মা আর সীমার মায়ের মৃত্যুর পরে কেউই করেনি আমাকে। প্রাণই যাবে আদরের চোটে।

আহা ! নিজে হাতে সব আনলেন। আমি তো রেঁধেই দিচ্ছি শুধু। পাবদা মাছ হলে মাংস চাপাবো।

এমন সময় বাইরের গেট বন্ধ করার শব্দ হলো। তারপর দরজায় বেলও বাজলো।

ঐ যে ! বাটুমা এলো। ও ছাড়া কেউ নয়। ছেলেটার তর সয় না। একসঙ্গে এতোবার বেল টেপে না ! বলে বলে আর পারা গেলো না।

দরজা খুলতে উঠলেন শুভাশিস। বললেন, বয়সের দোষ। ঐ বয়সে আমারাও ওরকমই ছিলাম।

জিজ্ঞেস করে দরজা খুলবেন কিন্তু। ডাকাতি হয়ে গেছে পুজোর আগে, দুপুর বেলায় ; কাছেরই এক বাড়িতে। দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন, ফাঁকা বাড়িতে আপনি যখন থাকেন, তখন ডাকাত সেজে আমিও আসতে পারি কোনোদিন।

নলিনীর উপরে কথাটার এফেক্ট কী রকম হলো জানার জন্যে অপেক্ষা না করেই দরজা খুলে বলে উঠলেন, পেলি রে ? পেয়েছিস ? বাঃ বাঃ। জীতা রহো বেটা।

নলিনী ওদের কথা শুনছিলেন।

ভাবছিলেন এসেছেন মাত্র তিনদিন। কিন্তু তাঁর হাবে-ভাবে এতটুকুও আড়ষ্টতা নেই। আগে তো শুধু এক রাতের জন্যে পিপির বৌভাতের সময়ে এসেছিলেন। তাও কনে-পক্ষদের থাকার বন্দোবস্ত করেছিলেন জ্যোতিষ সেবার জ্যাকসন হোটেলে। জ্যোতিষের ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি থাকতো না। কিন্তু এখন ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে যেন এ বাড়িতেই সারাটা জীবনই কাটিয়েছেন। এমন আত্মসম্পন্ন স্বল্প সময়ের মধ্যেই সবাইকে আপন করে নেওয়া এবং আপন হওয়া পুরুষমানুষ নলিনী আগে দেখেননি। অবশ্য স্বামী ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ছাড়া ক'জন পুরুষ মানুষকেই বা দেখেছেন তিনি ! এই মানুষটির চরিত্রে দ্বিধা বলতে কিছুমাত্র নেই। অটুট আত্মবিশ্বাস সম্বন্ধে নিজের একটুও সন্দেহ নেই। এমন মানুষ কাছে থাকলেও ভরসা লাগে ; ভালো লাগে।

বাটুমা ! বাবা ! আর একটা অপকম্মো করো তো আমার জন্যে।

শুভাশিস বললেন।

তামিলনাড়ুর বাটুমা, হকচকিয়ে গিয়ে বললো, 'অপকম্মো' কেয়া সাহাব ?

এই সেরেছে ! অপকম্মো মানেই জানিস না। শোন্ তবে বলি। একটা বীয়ার আনতে পারবি বাবা? ব্ল্যাক-লেবেল বীয়ার ? দোকান আছে কাছাকাছি ? সাইকেল-রিক্সা নিয়ে যাবি। সোঁ করে যাবি সাঁ করে আসবি। টাকা নিয়ে যা।

বাটুমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বলল, বীর ?

বীর কি না জানি না বাবা ! ভীরা হলেও চলে যাবে আমার।

নলিনী ওঁদের কথা শুনে নিজের মনেই হাসছিলেন। মানুষটাকে যতই দেখছেন ততই ভালো লেগে যাচ্ছে ভারী। মনে মনে একটু ভয়ও যে পাচ্ছেন না, এমন নয়। কিন্তু সত্যিই ভালো লাগছে খুবই। ভালো লাগা কাকে বলে প্রায় ভুলেই গেছিলেন। এমন তুচ্ছ কথাবার্তার মধ্যেও যে হাসির এত কিছু থাকে, থাকে ভালোলাগার ; তা ভেবে অবাকই হচ্ছেন। এই ভালোলাগা সম্পূর্ণই নির্দোষ, তবু যেন এর মধ্যেও এক ধরনের নিষেধ সুপ্ত আছে। এক ধরনের নিহিত অপমানবোধ।

বাটুমা বললো বীর তো ফ্রীজমেই হ্যায় !

হ্যায় ?

অবাক হওয়া খুশিতে বললেন শুভাশিস।

হাঁ। সাব মেমসাব তো পীতে হ্যায় হর্ ইতোয়ার। আজ রাত মে পার্টি ভি তো হ্যায় না !

সাচ ? ওয়াহ ! তব তো মজা আ যায়ে গা।

বলেই, বাটুমাকে বললেন, ফ্রীজটা খুলে একবার দ্যাখোতো বাবা ! বীর না ভীরু তারপর নিজেই ফ্রিজের দরজা খুললেন। খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন। বাঃ ! এই নইলে বোনঝি-জামাই।

ঢাকা আপনার ঠান্ডা হয়ে গেলো যে।

ভেতর থেকে নলিনী ডাকলো শুভাশিসকে।

যাই বেয়ান। অ্যাই বাটুমা! বীর তো আছেই। এবার পান নিয়ে আয় তাহলে!

বাটুমা এবারে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো শুভাশিসের দিকে। উনি লক্ষ্য করলেন না কিন্তু নলিনী ভিতর থেকে বাটুমার চোখে চেয়ে করলেন তা। বাটুমার ভাবখানা, মানুষটা বারে বারে নানা অছিলাতে তাকে বাইরে পাঠাচ্ছে কেন? বাড়িতে আর কেউই নেই। এ বুড়োর নির্ঘাৎ কোনো বদ মতলব আছে। বুড়ো দেখালেও মানুষটা আসলে বুড়ো তো মোটেই নয়।

নলিনী বললেন, পান তো আমার কাছেই আছে। বলেন নি তো।

বলিনি, কারণ নেশা তো নেই। সব সময় খাই না।

তাহলে? কখন খান?

যখন খুব খুশি খুশি লাগে।

হেসে ফেললেন নলিনী কথা শুনে।

বললেন, এখন তাহলে খুব খুশি লাগছে?

দারুণ!

এমনিই! খুশির কারণ কখনও জিজ্ঞেস করতে নেই। দেখেননি, পাড়ার বাচ্চারা যখন ঘুড়ি ওড়ায় তখন ওদের চোখ-মুখ? একজনকে আমি ছাতের চিলেকোঠায় ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই। তুই ঘুড়ি ওড়াস কেন রে?

কী বললো?

নলিনী উৎসাহে শুধোলেন।

বললো, "এমনিই! ভালো লাগে তাই।" আসলে দিল্ যখন "খুশ" হবার তখন এমনি এমনিই হয়।

হাসলেন শুভাশিসের কথা শুনে নলিনী। শুভাশিসও যোগ দিলেন সেই হাসিতে।

"দিল খুশ" আজকাল খুব কমই হয়। মাঝে মাঝে একাও লাগে ভীষণ, এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও।

নিজের মনেই বললেন শুভাশিস।

ভালোবাসা না থাকলেও, ভালোবাসা স্মৃতি তো থাকেই। তাই নিয়ে তো চমৎকার বাঁচা যায়। বাঁচেও তো কত মানুষই। এই রকম বাঁচা-ও কি বেঁচে থাকা নয় বেয়াই?

নলিনী বললেন। স্বগতোক্তির মতো।

হাসলেন শুভাশিস। বললেন, আমার চলে-যাওয়া স্ত্রী সীমা, আমার বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মেয়ে কেতু এরাও কিন্তু কখনওই আমার নিজের জন্যে আমাকে ভালোবাসেনি। না। একটি দিনের জন্যেও নয়। অবশ্য শুধু ওরাই নয়, আপনিও হয়তো জ্যোতিষবাবুকে তাঁর নিজেরই জন্যে কখনওই ভালোবাসেননি।

জানি না। ভেবে দেখার অবকাশই পাই নি কখনো।

সাংসারিক সম্পর্কে ভালোবাসা বলে আমরা যে জিনিসকে জানি, তা বোধ হয় আসলে ভালোবাসা নয়।

কী তা তবে?

অবাক গলায় নলিনী চোখ তুলে শুধোলেন, হাতা নাড়তে নাড়তে।

ঐ একটু আগে আপনি যা বলেছিলেন না, সংস্কার না কি যেন? ঐ সংস্কার, অভ্যেস, জড়িয়ে-মড়িয়ে একসঙ্গে থাকা, একজনের কাছে অন্যজনের প্রয়োজনের কারণে নির্ভরশীল হয়ে থাকা, এই সবকেই আমরা ভালোবাসি বলে জানি। আমার তো এখন মনে হয় যে, কাছে থাকলে, ঘর করলে ভালোবাসা মরেই যায়।

নলিনী চুপ করে ভাবলেন এক লহমা।

বললেন, জানি না। কথাটা হয়তো ঠিকই। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর করে কথা বলেন বেয়াই। সীমাদি, মানে আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও কি এমনি করেই কথা বলতেন?

থমকে গেলেন শুভাশিস এক মুহূর্ত। বললেন, জানি না। তবে বললে, হয়তো পারতাম বলতে। কিন্তু আলোচনা তো করতেন শুধুই টাকা-পয়সার, মেয়ের পড়াশুনার, নাচের স্কুলের, গানের স্কুলের, পুজোর বাজারের, আত্মীয়-স্বজনের বিয়ের, অন্নপ্রাশনের, আমার শ্বশুরবাড়ির বাবদের গুষ্টির জন্মদিনের। সাংসারিক নানারকম রাজনীতি, যে-রাজনীতি ক্লাবের রাজনীতির

চেয়েও জঘন্য : এই সবই তো ছিলো মূর্খ্য আলোচনার বিষয়। তাই আমি কী চাই, কী ভালোবাসি তা জানার ছিল না কারোই। শুধু সীমারই নয়, আমি যাদের জানতাম তাদের কারোই। এইসব কথা, আপনার ভাষায় 'সুন্দর করে' বলা-কথা বলবার অবকাশ হয়নি কখনোই কোনো কাছের লোকদেরই। আমি সত্যিই হতভাগা!

নলিনী চুপ করে রইলেন।

শুভাশিস একটা সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে সিগারেট টেনে ধুঁয়ো ছাড়লেন। নলিনী একবার উঠে পাশের ভাঁড়ার ঘরে থেকে কী যেন আনতে গেলেন।

ফিরে আসতেই শুভাশিস বললেন, কী মনে হয় জানেন বেয়ান? এ নিয়ে আমি অনেকই ভেবেছি, কিন্তু সুন্দর করে বলার মতো কথা, এবং বলা যায় এমন মানুষও পাইনি বিশেষ। যদি-বা কখনও বলেওছি, বলেছেন, এ-সব কবিত্বের কথা শোনার সময় নেই। সব কথা সবাইকে বলা উচিতও নয়।

লজ্জা এবং সামান্য ভয়ে নলিনীর মুখে লালিমার ছোপ লাগলো, ভুরু দুটি ধনুকের মতো বেঁকে গেলো।

শুভাশিস জানালার মধ্যে দিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে বাগানের সীমানার সোনাঝুরি গাছের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বললেন, জানেন বেয়ান, মাঝে মাঝে ভাবি, গ্রামের নরম-গলার লাজুক হাঁসীরই মতো আমাদের নিজের নিজের ভালোবাসাকেও জীবনের সারাটাদিন যদি ছেড়েই রাখা যেতো তবে বেশ হতো। সন্ধ্যেবেলা সে নিজেই হেলতে-দুলতে প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-ক,প্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ-ক করতে করতে তার খোপে ফিরে আসতো। নির্জন গাছ-পালার মধ্যের ফিকে-কালো কাঁচের মতো পুকুরের জল, কলমী শাকের গন্ধ, বর্ষার পুকুরপারের কদমগাছের নিবিড় সুগন্ধি ছায়া, সবকিছুই তার মসৃণ পালকে মেখে দিয়ে তাকে খুশি থাকতে দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় তাকে যদি ফিরে আসতে দেওয়া যেতো সত্যিই বেশ হতো! ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখা কি সোজা ব্যাপার? কাকে যে বলে ভালোবাসা, তা বোঝে ক'জন মানুষ?

কি দেবো আপনার পানে? আমি কিন্তু কলকাত্তা পান্তি খাই।

চরম অ্যাক্টি-ক্লাইমেক্স ঘটিয়ে নলিনী বললেন। হয়তো ইচ্ছে করেই। পাগলকে সাঁকো নাড়াতে দেওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে ভেবে।

আমার পান? অ-খয়েরী জর্দা-মোহিনী।

সেটা আবার কি? বিস্ময়-চপল চোখ বড় বড় করে নলিনী বললেন।

জানেন না? খয়ের-ছাড়া চুন-সুপারি থাকবে। আর বাবা, একশ বিশ জর্দা।

বাবা একশ-বিশ আমার কাছে নেই। অনেক দাম ঐ জর্দার। আগে খেতাম। তিনশ আছে; সিং কোম্পানির। খাবেন তো?

আপনি নিজে হাতে দিলে বিষও খেতে পারি। আপনি দিলে কোনো শিং-এর গুঁতোকেই ভয় পাই না।

নলিনী মুখ তুলে বেয়াইকে কপট রাগের সঙ্গে বললেন, আপনি এমন করে কথা কি সব সময়েই, সকলের সঙ্গেই বলেন?

ধরা-পড়া শুভাশিস হেসে ফেললেন।

বললেন, লাভ হলো কি? কথা, সব তো কথারই কথা।

লোকসানই বা কি হয়েছে?

ঠোঁটের কোণের হাসি গোপন করার মিথ্যা চেষ্টা করে নলিনী শুধোলেন।

আবার হেসে ফেললেন শুভাশিস।

বললেন, না, তা হয়নি। সত্যি বললে বলব, লাভই হয়েছে। সব সময়ই। কম-বেশি যদিও। একুনি যেমন আপনার নিজের হাতে-সাজা পান অ-খয়েরী গুণ্ডি মোহিনী। আহ।

শুভাশিসের চা খাওয়া হলে পান সেজে এগিয়ে দিলেন নলিনী শুভাশিসকে।

আস্তে আস্তে বেশ সহজ হয়ে উঠেছেন নলিনী। বহু বছরের অনভ্যেস বড়ই আড়ষ্ট লাগছিল প্রথম প্রথম। বোকা-বোকা ব্যবহার করছিলেন। জ্যোতিষ ছাড়া এ-বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ তো এমন বাড়িরই লোকের মতো এসে কখনও থাকেননি! ভালো লাগছে। মিথ্যে বলবেন না, সত্যি খুবই লাগছে। কত বছর পরে বন্ধ ড্যাপসা মনের ঘরের দরজা-জানালাগুলো এই মানুষটি যেন চট্ করে খুলে দিয়েছেন এসেই। কত আলো, হাওয়া পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ। তাছাড়া, এত

অল্পতেই যে এত খুশি হওয়া যায় তাও জানেননি নলিনী আগে কখনওই। আসলে, ওঁর দিলও 'খুশ' হয়ে গেছে। যদি ওঁকেও কেউ হঠাৎই শুধোয়, "কেন"? তবে উনিও হয়তো উত্তরে বলবেন, "এমনিই"।

বেয়ান রাতে কিন্তু গান শুনবো আপনার। অর্গানটা বাজান তো ? একটু টেপাপেটি করে দেখছিলাম। মনে হলো, অনেকদিন টিউনিং করা হয়নি। টিউনিং করার লোক নেই এখানে ?

শুভাশিস শুধোলেন নলিনীকে।

নলিনী একটু বিব্রত বোধ করলেন। প্রথমে কী যে বলবেন, ভেবেই পেলেন না। তারপর বললেন ; ছিলেন তো একজন। দোকানও ছিলো। ছোট্ট। ক্যান্টনমেন্টের বাজারে। একটা সময় তো জব্বলপুরে আর্মিতে এবং রেলে অনেকই সাহেব এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা ছিলেন। পিয়ানো ও অর্গানও কম ছিলো না এই শহরে। যিনি সারাতেন তাঁর নাম ছিলো ব্রাগাঞ্জা না কি যেন। গোয়ানীজ্। পিঠে কুঁজ ছিলো ভদ্রলোকের। মনে আছে। দারুণ টিউনিং করতেন, বাজাতেনও দারুণ। বিশেষ করে সয়গল আর কাননবালার সব গান। উনিশশো তেপান্নে আমার বিয়ে হবার পর-পরই যখন আসি প্রথম এখানে তখন আমার বাবা জোর করেই অর্গানটা পাঠিয়ে দেন ভোপাল থেকে। কিছুদিন বাজাইও ; মানে, যতদিন আমার শাশুড়ী ছিলেন। উনি ভালোবাসতেন গান খুবই। তারপরই ...।

তারপরে ?

শুভাশিস শুধোলেন।

শেষ টিউনিং করেছিলাম ভৃগুর বিয়ের সময়। সেও আমি করিনি। পাশের বাড়ির শ্রাবণীর বাবাই কোথা থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন কাকে যেন!

শ্রাবণীর বাবা কি করেন ?

উনি শাহ-ওয়ালেসে কাজ করতেন। বড় কাজ। রিটায়ার করেছেন কয়েক বছর হলো।

নাম কি ভদ্রলোকের ?

হিতেন সেন।

গান-বাজনা ভালোবাসেন বুঝি খুব ?

তেমন প্রাণ তো কিছু পাইনি আগে। প্রতিবেশী হিতেনবাবু সম্বন্ধে শুভাশিসের অদম্য কৌতূহলে একটু অবাক হয়েই নলিনী বললেন।

তারপরই বললেন, হঠাৎ এই প্রশ্ন ?

গান-বাজনা ভালো না-বাসলেও আপনাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসেন। নইলে, অর্গান-টিউন করাবার লোকই বা ধরে আনবেন কেন ?

নলিনী হেসে উঠলেন। লজ্জাও পেলেন। বললেন, আপনার মাথায় আসেও বেয়াই! এইজন্যই বলে অ্যান আইডেল ব্রেইন ইজ আ ডেভিলস্ ওয়ার্কসপ।

তা বলে নিশ্চয়ই! তবে, ডেভিলে ডেভিলে তফাত আছে। আমি একরকম ডেভিল আর হিতেন সেন অন্যরকমের। কেউ ডিমের ডেভিল ; কেউ এঁচড়ের। যাই-ই হোক, ওঁর কাছে আমাকে যেতেই হবে। ভদ্রলোকের চেহারা-ছবি-ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একবার সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে হবে। এবং টিউনিং-এর লোকও ধরতে হবে তাঁরই মাধ্যমে। পিয়ানো বা অর্গান এই অবস্থায় ফেলে রাখলে সরস্বতী রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান যে, তা মানেন তো ?

সরস্বতী অথবা লক্ষ্মী কাউকেই আমার আর দরকার নেই বেয়াই। এখন শ্রীহরি থাকলেই হলো।

এমন ডিপ্রেসিভ কথাবার্তা বলবেন না তো! দিনতো যাবে সকলেরই। একদিন না একদিন। সন্ধ্যেও নামবে জীবনে। আমরা চাই আর নাই-ই চাই। যতক্ষণ থাকি হেসে-খেলে থাকাই কি ভালো নয় ? আমি তো তাই-ই বুঝি।

নলিনী ওঁর কথার উত্তরে কিছু না বলে, খাওয়ার ঘরের টেবল থেকে শুভাশিসের চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

এই মানুষটার উপরে হঠাৎই ভীষণ রাগ হলো ওঁর। এলেন যদি, এত দেরী করে কেন ? কী লাভ ? লাভ কি ? বড়ই বিশ্রী ব্যাপার হলো তাঁর শৈশবের বৈশাখী-হাওয়া-বওয়া পবিত্র ছেলেবেলার পুতুলখেলায়, অবুঝ কৈশোরের গা-শিরশির-করা কোকিল-ডাকা নির্জন, হলুদ-রঙা দুপুরে ; তাঁর অনভিজ্ঞ প্রথম যৌবনের ফিকে-ম্যাজেন্টা রঙা আরক্ত সব সুন্দর আবেশের

মধ্য-রাতের স্বল্পময়তার মধ্যে যে পুরুষটি ছিলো, তাঁর কল্পনার পুরুষ, যা প্রত্যেকটি নারীরই থাকে, সেই পুরুষই এসে হাজির আজ সশরীরে তেপান্ন বছরের শ্রীহীনা নলিনী, জ্যোতিষ রায়ের বিধবা এবং টুটু রায়ের ঠাকুমার জীবনের দিনশেষে ! আচ্ছা ! কোনো মানে হয় ? মিছিমিছি !

শুভাশিস বীয়ার ঠিক এক বোতলই খেলেন। যদিও ফ্রিজ-এ আরো ছিলো। বললেন, বিকেলে বোনঝি-জামাই-এর স্টক রিপ্লেনিশ করে দেবো।

জ্যোতিষ এসব বিষ কখনও ছুঁয়েও দেখেননি জীবনে। ভীষণই অপছন্দ করতেন মদ খাওয়া। কিন্তু ছেলে-বৌরা খায়। একজন মানুষের, তিনি যত রাশভারী আর একরোখাই হন না কেন ; তাঁর নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ সবই তাঁর চিতাতলেই জ্বলে খাক হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা হুবহু বাবারই মতো ; অথবা তাঁর মতামতের প্রতি অটুট শ্রদ্ধাশীল ক'জন আর হয় ? তাই নিজেকেও ছেলে-বৌ-এর নব্য জীবনে স্রোতের মুখে বাধা করে তোলেননি নলিনী আদৌ। আসলে জানতেন যে অশক্ত বাধা সহজে ভেসেও যায়। এখন ছেলে-বৌ-এর আশ্রয়েই থাকা। সমীহ করেই চলতে হয়। তারা মতামতকে আসলে কোনো দামই যে দেয় না তা তিনি জানেন বলেই নিজের সম্মান নিয়ে নিজে সরে দাঁড়িয়েছেন সুসময়ে। শুভাশিসের কী ! তিনি তো পুরুষ; স্বয়ম্ভর।

বীয়ার খাওয়ার পর খুবই তৃপ্তি করে দুপুরের খাওয়া খেয়েছিলেন শুভাশিস। এমন মানুষকে খাইয়ে সত্যিই আনন্দও আছে। রান্নার তারিফ করতে জানেন। জ্যোতিষ সব সময়ই নিজের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন ছিলেন। মাপা-খাওয়া, পূর্ব নির্ধারিত পদ, প্রত্যেকটি দিন ঘড়ির কাঁটায়, একই সময়ে। এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো ছিলো না। অথচ এমন কিছু বেশি বেশি বাঁচলেনও না। যতদিন বাঁচলেন, ততদিনই কী করে বেশি বাঁচা যায় এই চিন্তাতেই ক্লিষ্ট হয়ে রইলেন। শুভাশিসের আর জ্যোতিষের মধ্যে তফাত অনেকই।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে আধ ঘন্টাটাক। নলিনীকে ওঁর সঙ্গেই খেতে হয়েছিলো বসে। শুভাশিস, নইলে খাবেনই না বলে ধরেছিলো। বাটুমা পরিবেশন করেছিলেন। খাওয়ার পরই নলিনীর শরীর একটু বিশ্রাম চায়। গত তেত্রিশ বছরের অভ্যেস। প্রথম-প্রথম এইটুকুই একমাত্র বিলাস ছিলো। এখন প্রয়োজন। দুপুরে ঘন্টাখানেক শুয়ে না নিলে রাত এগারোটা অবধি আর জাগতে পারেন না। অনেকদিন তো হলোও এই চাকরি ! মাইনে নেই, হাত খরচ নেই, সপ্তাহে একদিনও ছুটি নেই, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচ্যুইটি এসব কিছুই নেই। পেনসন তো নেই-ই। বড়ই ক্লান্তি বোধ করেন। তাঁর মনের ওপরে এই চাকরীর অবশ্য কিছুমাত্রই দাবী ছিল না কখনও। শুধু শরীরেরই দাবী। নানাভাবে শুধু শরীর দিয়েই এই চাকরি করেছেন জ্যোতিষের কাছেও। অন্যভাবে করছেন এখন। ছেলে-বউয়ের কাছে।

মৃত্যু ছাড়া এই চাকরি থেকে মুক্তিও নেই।

বেয়াই বলেছেন, বিকেল সাড়ে-চারটেতে চা খেয়ে হাঁটতে বেরোবেন। উনি নলিনীকে সঙ্গে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। পীড়াপীড়িও করেছিলেন। নলিনী শুধু হেসেছিলেন শুনে। তাঁর জীবন, নিশ্ছিদ্র কাজের। নিরানন্দরও। একমাত্র আনন্দ, যখন বাগানে থাকেন। ফুল-ফোটা ফুল-ঝরার মধ্যে জীবনের স্বাভাবিক এবং অমোঘ সব নিয়মেই নিরুচ্চারিত প্রতিপাদ্যকে নিঃশর্তে পালিত ও প্রমাণিত হতে দেখেন। জোর পান একটু ; দুর্বল মনে তখন। কেউ তো জানে না আরো কত দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে তাঁকে ! কোনো গুণী-জ্ঞানী মানুষ ; লেখক কবি, শিল্পী ইত্যাদি ছাড়া, দীর্ঘ আয়ু সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই অভিসাপের। জীবনের সঙ্গে যতদিন হাসি মুখে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক রাখা যায়, তা রেখে সকালে-সকালে চলে যাওয়াই ভালো। বিকেলের আকাশের কথা আগে থাকতে কেউই বলতে পারেন না।

বেড়াতে যাবেন তিনি ! ছেলে-বৌ-অফিস থেকে এসেই জল-খাবার আর চা খাবে। তারপর বন্দোবস্ত করতে হবে। টুটুর রাতের খাবারের দেখাশুনাও তো করতে হবে একটু পরে। সন্ধে সাতটায় টুটুর ডিনার ! ছেলে-বৌ পরে, প্রায় দশটা নাগাত খায়। টুটু দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এলেও টুটুকে খাওয়ানোর ভার তারই। নিজের খাওয়া হয়ে গেলে টুটুকে কাছে নিয়ে শোন নলিনী। বাগানের এককোণে কুয়ো আছে। খোলা। ছেলেটা বড়ই দূরন্ত। কখনও কিছু ঘটে যায় যদি, একথা ভাবলেই টুটুর জন্যে যতনা চিন্তা হয় ওর, তার চেয়েও বেশি চিন্তা হয় নিজের জন্যে ; মানুষ বড় স্বার্থপর। বোঝেন নলিনী। কিন্তু যারা অসহায় শুধুমাত্র তারাই জানেন যে অসহায়দের স্বার্থপর হতে হয় শুধুমাত্র বেঁচে থাকারই জন্যে তবু, এই টুটু, তার চার বছরের

নাতিনটি এখন তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। কত যে মজার মজার কথা বলে সে! তার উজ্জ্বল দুটি চোখে নবীন পৃথিবীর প্রতি এক দূরন্ত ঔৎসুক্য ঝিকমিক করে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সে নলিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ওর লাগাতার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নলিনী যেন অনুবধানে নিজেরও অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যান। সে সব প্রশ্ন যে তার বুকেরও গভীরে লুকোনো ছিল এত বছর পর সে খবরটা পর্যন্ত অজানা ছিল তাঁর। নিজের জীবনের ঘরের ঔৎসুক্যর জানালাগুলিকে যখন একে একে বন্ধ করে দিয়েছেন, নিবৃত্তির কাঠের টুকরোর উপর সমর্পনের গজাল ঠুকে ঠুকে ; ঠিক তখনই এই চার বছরের নিষ্পাপ, অকৃত্রিম, সরল শিশু তাঁর ছোট্ট নরম হাত দুখানি দিয়ে সেই জানালাগুলিরই কপাটগুলিতে সজোরে টান মেরে জানালার মরচে ধরা কব্জাতে কড়মর শব্দ তুলে খুলতে চেষ্টা করে! নলিনীর নিজের এই বন্ধ জীবনে খোলা জানালার প্রয়োজন সবই ফুরিয়ে গেছিল। আজকে টুটু তার অনেকখানি। তিনিও টুটুর। কিন্তু কোনোই শিশুই যে চিরদিন শিশু থাকে না। তার আদরের নাতি টুটুরও অল্প কিছুদিন পরই নলিনীকে আর হয়তো দরকার হবে না। যেমন একদিনের শিশু-পুত্র ভৃগুর কোনোই দরকার পড়ে আজ আর তাঁকে ; একমাত্র অসুস্থ্য সময় ছাড়া। টুটুর বাঁধনটা ছিঁড়তে পারলেই তিনি মুক্ত। অবশ্য জানেন না, টুটুর কোনো বোন আসবে কি না। বোন অথবা ভাই।

একদিন বাগানে ঘুরতে ঘুরতে ওদের বেডরুম থেকে এই ব্যাপারে দুজনের আলোচনা শুনেছিলেন এক রবিবার বিকেলে। উনি চান যে আসুক। নইলে তার এই স্বাধীনতাহীন বন্দিনী জীবন যে টুটু বড় হলে বিনা মায়নার কর্মচারীরই মতো হয়ে যাবে। এই চাকরিতে যেটুকু সম্ভ্রান্ততার মোড়ক আছে তারও রঙ চটে যাবে।

বাগানে বুলবুলি আর টিয়া ডাকছিলো। ঠিকে মালি এসে যাবে একটু পরেই। শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন নলিনী। টুটুকে আজকে স্কুল থেকেই পরিমলবাবু নিয়ে গেছেন তাঁদের বাড়িতে। তাঁর ছেলের জন্মদিন আজকে। টুটুর সঙ্গে পড়ে সে। ভৃগু আর গিগি অফিস-ফেরতা তুলে নিয়ে আসবে একেবারে। এমনই কথা আছে।

মালি এসে একটু পরই জল দেবে বাগানে। নিঃশব্দে। কোনো গাছের মরা ডাল কাটবে, ছাঁটবে। যৌবনের প্রতীক এই বাগানে সৌন্দর্যর বড়ই বিঘ্ন ঘটায় ওরা।

কোনো কাতর উপোসী গাছ যখন জল পায়, আকণ্ঠে জল খায় ; রুখু গাছ, তখন শব্দ হয়না কোনোই। অন্য কেউই তা জানতেও পারে না। যে জল দেয় শুধু সেই-ই জানে, আর যে জল পায় ; জানে সেই তৃষ্ণিতই।

নলিনী পাশ ফিরে শুলেন।

আজ নলিনীর কিছুতেই ঘুম আসছে না। চোখ বন্ধ করলেই শুভাশিসের মুখটা ভেসে উঠছে কেবলই। এমন অসুখ তার কখনই করেনি। ভারী ভয় পেয়ে যাচ্ছে নলিনী। কী যে হলো!

॥ ৩ ॥

শুভাশিস চলে গেছেন কানহাতে আই.টি.ডি.সি-র গাড়ি ভাড়া করে। নলিনীকেও যাওয়ার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন।

বড়ই অবুঝ মানুষটা।

ছেলে-বৌ দেখিয়েছিলো যে, তারা নিম-রাজি। কিন্তু নলিনীর যাওয়ার কোনো উপায়ই নেই। সে-কথা নলিনী যেমন জানেন, ওরাও জানতো। রান্না কে করবে? কে দেখবে টুটুকে?

মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত এই কারাগার থেকে সত্যিই মুক্তি নেই ওঁর। এই কারাগারের প্রাচীর দেখা যায় না। সার্চ-লাইট জ্বেলে সান্ত্রীরা পাহারা দেয় এখানে। তবু নিজেরা নিজেদের মুক্ত করতে পারেননি বলেই এই কারাগারের কোনো কয়েদীই মুক্তি পায়নি। এই সংসার যে সত্যিই কারাগারই এ-কথাটা কলকাতা থেকে গিগির মেজমামা এমন হঠাৎ এসে সাতটা দিন না থেকে গেলে নলিনী এমন করে জানতেও হয়তো পারতেন না। মানুষটার শত অনুরোধেও তাঁর সঙ্গে বিকেলে একটু হাঁটতে যাওয়ারও উপায় ছিলো না তাঁর। বাধা ছিলো অনেকই রকম। ভিতরের তো বটেই, বাইরের বাধাও কম ছিলো না। ভৃগু আর গিগির চোখে তারই বিজ্ঞপ্তি পড়েছিলেন উনি। উনি একটু পান, সুখে থাকুন তা কেউ-ই চায় না। বাটুমারই মতো, তাকেও মিষ্টি কথায় বা কখনও রাগ দেখিয়ে ওরা ওদের সব কাজই করিয়ে নিচ্ছে। ঠকাচ্ছে নিজেদের স্বার্থে। তফাৎ

এই-ই যে, বাটমা মাইনে পায় আর উনি পাননা। বাটমা সত্যিই একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেও পারে কিন্তু উনি পারেন না।

যে-মানুষটির সঙ্গে বিকেলের আধ ঘন্টার জন্যে হাঁটতে যেতেও পারেননি, তাঁর সঙ্গে অতদূর গিয়ে পনেরো দিন থাকা ? ভাবতেও পারেন না। হবে না, হবে না। যা হবার তা হয়ে গেছে এই জন্মের মতো।

ছেলে মানুষেরই মতো অনেকেই লোভ দেখিয়েছিলেন শুভাশিস। যেন, নলিনী এখনও কলেজেরই ছাত্রী। বলেছিলেন, খাজুরাহো নিয়ে যাবো, পাঁচমারী পাহাড়েও। যেখানে ঝর্ণা চলে কুলকুল করে।

হেসে বলেছিলেন, এক ঘরে থাকতে হবে না বেয়ান আমার সঙ্গে আপনাকে। অন্য ঘরেই থাকবেন আপনি। সঙ্গে গাড়ী থাকবে। গাড়ী করে যেখানে খুশি সেখানে বেড়িয়ে বেড়াবো। কানহা-কিসলির দারুণ সুন্দর বনে। ঘাসের মাঠে মাঠে। হু-হু হাওয়া লাগবে চোখে-মুখে। আপনি গান শোনাবেন যেতে-যেতে। মাঝে-মাঝে নিজে হাতে পান সেজে দেবেন জর্দা দিয়ে। কী মজাই না হবে ! চলুন চলুন ! 'না' করবেন না বেয়ান। পৃথিবীকে ভালোবাসার লোক বড় কম। 'না' করবেন না ! আর সময়ও তো আমাদের বেশি বাকি নেই।

তবুও না করতেই হয়েছিলো। হয়নি যাওয়া।

গত রবিবারে যখন ভোর পাঁচটাতে যখন চলে যান শুভাশিস, তখন গিগি আর ভৃগু ঘুমোচ্ছিল। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা বড় দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে। জব্বলপুর থেকে মানদোলা যাবেন। সেখান থেকে কানহা-কিস্‌লিতে। গাড়ীতে ওঠার সময় জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলেছিলেন, চিঠি লিখবো। উত্তর দেবেন বেয়ান। নইলে ভারী রাগ করবো কিন্তু।

রাগ করতেও পারেন, করলে। যিনি আদর করেন তিনিই রাগ করতে পারেন। আদর যে কাকে বলে তা তো ও জীবনে জানেননি, বাবার কাছ থেকে চলে আসার পর থেকে। এই মানুষটির মধ্যে নলিনীর বাবারও একটি টুকরো আছে। মনে হয় ওঁর অনেক টুকরো জড়ো করেই তো একটি আস্ত মানুষ হয়।

এই সাত দিনেই এই ছোট্ট পরিবারে অনেক অশান্তিও হয়ে গেছে মানুষটিকে নিয়ে। সত্যিই রান্নাঘরের জন্য একজস্ট ফ্যান কিনে এনেছিলেন উনি। শুধু এনেছিলেন তাই-ই নয়, পরদিনই রাজমিস্ত্রী এনে রান্নাঘরের দেওয়াল ফুটো করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে তা লাগিয়েও দিয়েছেন।

ব্রাগানজা সাহেবকে পাননি। সে বুড়ো না কি দেখ রেখেছেন। তাঁর মাঝ বয়সী ছেলেকে নিয়ে এসে অর্গানটিও টিউন করিয়ে দিয়েছেন। তাকে এক বছরের টাকাও অগ্রিম দিয়েছেন যাতে প্রতি মাসেই নিয়মিত এসে সে অর্গান টিউন করে দিয়ে যায়।

যে কটি দিন ছিলেন প্রত্যেকদিন সকালেই নিজে গিয়ে সাইকেল-রিক্সা করে বাজার শুদ্ধ কিনে এনেছেন। ফল ভালো হয়নি। একেবারেই ভালো হয়নি। এবারে এলেন এলেন, ওর পরের বার আসতে চাইলেও গিগি আর ভৃগু হয়তো তাঁকে আসতে মানাই করবে। মিথ্যে অসুবিধের অছিলাতে। শুভাশিস জানেনও না যে, তিনি আর কখনও না এলে কতখানি ক্ষতি হবে সংসারের এই অসহায় বন্দিনীর। ছেলে-বৌ মোটেই খুশি হয়নি এই নিস্তরঙ্গ, বিধিবদ্ধ সংসারের প্রাত্যহিক নিয়মে ঝোড়ো হাওয়ারই মতো শুভাশিসের ঢুকে পড়ায়। এই সংসারের অনেক কিছুই লণ্ডভণ্ড গোলমাল করে দিয়েছেন তিনি।

রাতে খাবার টেবলে বসে গিগি বলছিলো, মেজোমামার বড় টাকার গরম হয়েছে। চিরদিনই অবশ্য এরকম। হি স্টিংকস অফ মানি। আমি এই রকম ওভারবেয়ারিং মানুষদের মোটে দেখতে পারি না।

ভৃগু বলছিলো, ভদ্রলোক অন্যর প্রাইভেসী, অন্যর সেন্স অফ প্রাইডকে হার্ট করেন। হয়তো, না জেনেই করেন। তবুও। রোজ নিজেই যদি বাজার করবেন, আমাদের যদি কিছুমাত্রই করতে নাই-ই দেবেন ওঁর জন্যে, তাহলে তো জ্যাকসন হোটেলেই থাকতে পারতেন। এখানে থাকা কেন ? বড্ডই শো-অফফ করেন উনি।

নলিনী মীনমীন করে বলতে গেছিলেন, না রে ! হয়তো ওঁর স্বভাবটাই ওরকম। অত ভেবেচিন্তে কিছু কি আর করেন ? মনে তো হয় না ! নিজের মনে কোনো কালিমা না থাকায় অন্যর মন নিয়ে ভাবেই না হয়তো !

গিগি পায়েসের বাটিতে চামচ ডুবিয়ে বলেছিলো, কী যে বলো তুমি ! মা, তুমি যেন আমার মেজমামাকে আমার চেয়েও বেশি চেনো ! মেজোমামা বড়মামার সঙ্গে যা ব্যবহার করেছিলেন, তা আমরাই জানি । এইসব নোংরা, নিজের পরিবারের এই সব নোংরা কথা বলতে চাই না । কোনোদিন বলিওনি কাউকে । এসব উদারতা ওঁর পুরোপুরি পোশাকী ! ধুরন্ধুর লোক । নইলে এখনও এতো রেস্তো থাকে । এতো খরচ তো রাজা-মহারাজারাও করতে পারেন না ।

বড়লোক তো হয় অনেকেই কিন্তু টাকা থাকলেই কি সবাই খরচ করতে পারে গিগি ? খরচ করার মন থাকা চাই ।

নলিনী ভীত গলায় দুঃসাহসীর মতো আবার বলেছিলেন । নিচু মুখে ।

ভৃগু বলল, মন-এর কথা বোলো না মা । ভদ্রলোকের বেশ এগজিবিশনিস্ট স্বভাব । বড়লোক অনেকই কিন্তু এমন করে ক্রুড বড়লোকি দেখাতে কাউকেই দেখিনি । আমরা না হয় ওঁর তুলনাতে গরীবই ! কিন্তু তা বলে ডিসেন্সী রেখেই সব কিছু করা উচিত । এই অর্গানটা তুমি কবেই বা বাজাও ? ইদুর আর আরশোলার বাসা হয়েই তো ছিলো । এত বছর আমার বিয়ের পর থেকে । তাকে টিউন করার জন্যে তড়িঘড়ি লোক ধরে নিয়ে আসা, বাবার বানানো এমন পোড়বাড়ির দেওয়াল ভেঙে এক এগজস্ট-ফ্যান লাগানো এসব আমাদের আপমানেরই জন্যে । ডেলিবারেটলী করা । তেত্রিশ বছর তোমার গরম লাগলো না আর আজ এই শীতের মুখে এমন গরমবোধ করলে তুমি ।

বিরক্ত গলায় বললো ভৃগু ।

গিগি বললো, তুমি কি রান্নাঘরে গরম লাগার কথা কিছু বলেছিলে মেজোমামাকে ? মা ?

আমি ? আমি ...

লজ্জায় মরে গেলেন নলিনী ।

বললেন, তোমরা এ কী কথা বলছো ? আমি কি বলতে পারি ? এতগুলো বছর তো এই রান্নাঘরেই ...

ভৃগু বলল, অসভ্যের মতো, মা, কিছু মনে করো না, তোমার প্রতি প্রেম যেন ওর একেবারে উথলে উঠেছিলো । যাই-ই বলো আর তাই-ই বলো ।

ভৃগু তাঁর নিজেরই গর্ভের সন্তান বলে খুবই লজ্জা হলো নলিনীর ।

ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে । ভাবছিলেন জ্যোতিষ রায়েরই ে ল তো । প্রেমের কী বোঝে ও ?

গিগি বললো, মেজমামা, মেজমাইমাকেও কোনোদিনও সুখে রাখেননি । অনেক গার্ল ফ্রেন্ড-ট্রেন্ড ছিলো । ক্লাব-পার্টি । নিজের বৌ-এর সুখবিধান করতে দেখিনি কখনও আর এখন স্ত্রী মারা যাবার পর এলেন আমার শাশুড়ীর সুখ দেখতে । হাসি পায় ! আদিখ্যেতা নয় ? বলো ?

বলেই, ভৃগুর দিকে ফিরলো ।

টুটুকে একটা ভালো প্রেজেন্ট কিনে দিলেও তো পারতেন ? তোমাকে একটা ভালো শাড়ি ? তাহলেও বুঝতাম ? ঐ বুড়োর চরিত্রদোষ আছে । ও বুড়োর মতলব আমার জানা হয়ে গেছে । বলেই, নলিনীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে, খাওয়া থামিয়ে ভৃগু অত্যন্ত উষ্মার সঙ্গে বললো । তুমি সাবধানে থাকবে মা ।

নলিনী জবাব দিলেন না । নিজের লজ্জায় এবং ছেলের নির্জ্জতায় তাঁর বাকরোধ হয়ে গেছিলো ।

গিগি বললো, বুড়ো বুড়ো কোরো না । মেজমামা বুড়ো মোটেই নন । এবং নন বলেই তো ওঁকে নিয়ে ভয় ।

এবারে কান্না এবং হাসি দুই-ই একসঙ্গে এলো নলিনীর ।

ঠিক সেই সময় বাটুমা রান্নাঘর থেকে খাবর ঘরে এলো । দ্রুত পায়ে বাটুমার কথা ওরা সবাই-ই ভুলেই গেছিলো । ওদের সব কথাই কি বাটুমাও শুনেছে ?

একটু লজ্জিত হলো ভৃগু । গিগিও । কিছু বলতে যাবে গিগি ওকে, এমন সময় সম্পূর্ণ বিনা-এক্সপ্যারে সে বলল, "উও বাবু বহুৎই আচ্ছা আদমী হ্যায় ।"

তুই চুপ কর । ভৃগু বললো ধমকে । বড্ড সাহস হয়েছে তোর ।

মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে বাটুমা তার আড়ালে খারাপ কথা বললে আমি মানব কেন ? আমার কিসের ভয় ? পছন্দ না হলে ছাড়িয়ে দাও । আমি কি জলে পড়ে আছে না কি ? ডবল-

মায়ানাতে চলে যাবো কালই। পড়ে আছি, শুধু মায়েরই জন্যে। ছোট্টবেলা থেকে আমি মায়ের কাছে। এতদিনের সম্পর্ক তোমাদের সঙ্গে! অন্যায় আমি সহ্য করি না। করবো না।

বা-ট্ট-মা।

এই তিনটি অক্ষরে তার মনিবী, বেলুনেরই মতো ফুলে ভৃগু রাগে ফেটে পড়ে বললো, মুখ সামলে কথা বলবি। বেয়াদব ছোকরা।

বাটুমাও রুখে উঠে বললো, কিসের মুখ সামলানো? আমি কখনো ঝগড়া করেছি? আপনাদেরই আত্মীয়; সাতদিনের জন্যে মানুষটা এলো; আর আপনারা যা নয় তাই-ই বলবেন? না। অন্যায় আমি সহ্য করবো না। আপনারা কেমন ভদ্রলোক জানি না। সত্যি! শেষে বাটুমা তার রক্ষাকর্তা হলো! বড় গ্লানির সঙ্গেই নলিনী এবার বললেন, বাটুমা।

শাসনের গলায়।

মুখ নিচু করেই বললেন। বড়ই লজ্জা করছিলো ওঁর।

বাটুমা ভৃগুকে বললো, আপনারা তো হোটেলেই থাকেন। খানদান, চলে যান। আপনারা ঐ মানুষটাকে কতটুকু দেখেছেন? জানেন আপনারা যে, টুটুর জন্যে উনি হারক্যুলিস সাইকেল-অর্ডার দিয়ে গেছেন? টুটু লাল রঙেরই চেয়েছিলো। দোকানে লাল-রঙা ছিলো না বলেই আনতে পারেননি। বলেছেন, ফিরে এসেই দোকান থেকে নিয়ে আসবেন। দোকানদার আনিয়ে রাখবে এর মধ্যে। আর অ্যাই দেখুন, আমাকে কি দিয়েছেন। বলেই, প্যান্টের বাঁ পকেটে হাত চালান করেই বের করে দেখালো। ভৃগু ও গিগি চোখ বড় বড় করে দেখলো, নতুন চকচকে এইচ.এম.টি. ঘড়ি। জওয়ান। কালো ডায়ালের রেডিয়াম দেওয়া।

বাটুমা বললো, বাবু বলেছিলেন, টুটুকে আনতে তোর আর দেরী হবে না। একদিন টুটু বসেছিলো পনেরো মিনিট স্কুলে। মায়ের ঘরের পুরোনো টেবল-ঘড়িটা কেবলি তো স্লো হয়ে যায়। সেদিন পনেরো মিনিট স্লো ছিলো, সকালে মিলানো সত্ত্বেও।

মাকেও ঘড়ি দেননি কিনে? মেজমামা?

ঠাট্টার গলায় গিগি শুধোলো।

হ্যাঁ।

বাটুমা বললো।

আতঙ্কিত অবিশ্বাসের গলায় নলিনী তাকালেন বাটুমার দিকে।

কি? মা বলেনি তো কাউকে।

ভৃগু বললো।

ওদের দুজনেরই চোখের তারা বিস্ময়ে বিস্ফোরিত করে।

মাকেও দিয়েছেন? নলিনীর দিকে ফিরে গিগি বললো এবারে। এ কথাটা তো চেপে গেছো মা!

নলিনী হতভম্বরই মতো চেয়ে রইলেন পুত্রবধূর দিকে। খুব রাগ হচ্ছিলো বাটুমার উপরে। মিথ্যুক ছেলে।

বাটুমা বললো, এখনো দেননি। তবে, দেবেন বলেছেন। আমাকে বলেছেন, এই সব দম-দেওয়া ঘড়ি আজকাল অচল। এমন ঘড়ি দেবেন মাকে যে, দম দিতেই হবে না আর। কোয়ার্টার না কী যেন নাম! মায়ের জন্যে সেই ঘড়িরও উনি অর্ডার দিয়ে গেছেন। যেদিন জব্বলপুর থেকে কলকাতা ফিরে যাবেন সেদিনই সব দেবেন। আগে দিতে লজ্জা করে ওঁর। ইসস। দেখেছো! আমি যে সবই বলেদিলাম!

গত কথা কি সব তোর সঙ্গেই হতো? ভারী খারাপ স্বভাব তো তোমার মেজমামার গিগি।

তা হবে না কেন? রাতে পা টিপতাম যে। আমিও যে ওঁরই মতো একজন মানুষ, আমার তাই-ই মনে হতো ওঁর সঙ্গে কথা বলে।

বলেই বাটুমা বললো, আপনাদেরও কি দেবেন তা জানেন? হুঁ হুঁ। বলব?

আমাদের?

ভৃগু বললো।

আমাদের? গিগিও বললো।

হ্যাঁ। আপনাদের।

কি?

পাথরের মতো ঠাণ্ডা. উত্তেজনা চাপা দেওয়া গলায় শুধোলো গিগি।

বটল-কুলার আর এয়ার-কুলার।

কি ?

ভৃগু আর গিগি দুজনেই একই সঙ্গে বলে উঠলো।

হ্যাঁ। বীর-টীর তো থাকে ফ্রিজটাতে। ফ্রিজে অন্য জিনিস, মানে মাছ-মাংস তরকারী এসব আঁটে না। ফ্রিজটা তো ছোট্ট। বাজে।

অ্যাই ! বাজে কথা বলবি না একদম। আমার বিয়ের সময় বাবা দিয়েছিলেন। এ বাড়িতে ফ্রিজই ছিলো না আগে। তোর দাদাবাবুর বাবা তো ফ্রিজে রাখা বাসি জিনিস খাওয়াই পছন্দ করতেন না। তুই কি জানিস রে ?

গিগি বললো খুব রাগের গলায়।

ঐ হলো। অতটুকু ফ্রিজে কি অতসব জিনিস আঁটে ? বটল-কুলার, অনেক জলের বোতল, কাম্পা কোলা, সোডা, বীর-টীর সব রাখা যাবে। পার্টি হলে একটুও অসুবিধে হবে না।

বলেই, একটু থেমে বললো ; বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে গরমের সময় খুবই গরম হয়, না রে বাটুমা ?

তুই কি বললি ?

ভৃগু তম্বি করে শুধোলো বাটুমাকে।

বাঃ রে। মিথ্যা কেন বলব ? বলব কি যে গরমের সময়ে জব্বলপুরে বরফ পড়ে ? বললাম, বইতই গরমী।

বাবু বললেন, ইসস্, গিগিটা বড় আরামী মেয়ে। ওর মায়ের কত আদরের মেয়ে ও জানিস ব্যাটা তুই ? তাছাড়া টুটু আর তার ঠাকুমাও দুপুরে একটু আরাম করতে পারবেন। এয়ার-কুলার অর্ডার দিয়েছেন বাবু দুটো। ভালোই হলো ! গরমের দুপুরে আমিও মায়ের ঘরের মেঝেতেই শুয়ে ঘুম লাগাবো।

গিগি হেসে ফেললো ওর কথার ধরনে। ওর মনও বোধহয় এতসব প্রাপ্তিযোগের খবরে একটু দ্রবীভূত হয়েছিলো। পুরো বিশ্বাস হল না। এই বাটুমা ছেলেটা মহা ত্যাঁদোর। একমাত্র গিগি জানে। কিছু বলে না যদিও। বাটুমা জানে না যে গিগি সবই জানে।

ভৃগু বলল, ইটস্ ট্যু মাচ্। আমরা কি ভিখিরী না কি ? তোমার মেজমামাকে লিখে দাও যেন এখানে ফিরেই না আসেন আর।

আহা ! তোমার যতো বাড়াবাড়ি ! ভালোবেসে বোনঝি-বোনঝি-জামাইকে জিনিস দিচ্ছেন তাতে তোমার এত উত্তেজনার কি ? বিয়ের সময়ে তোমরা কি একটি লিস্ট ধরিয়ে দাওনি। আমার বাবার হাতে কী কী দিতে হবে তার ফিরিস্তি দিয়ে ? আমার বাবার অবস্থা তখন পড়ে গেছিলো মামাদেরও কিছুই জানাননি। আত্মসম্মানেরই কারণে। এখন মনে করো মেজোমামা, তোমাদের পুরোনো চাহিদাই মেক-আপ দিচ্ছেন।

ভৃগু কিছু বলার আগেই নলিনী খাওয়ার টেবল ছেড়ে উঠলেন। যাওয়ার সময় নিচু গলায় বললেন, বাটুমা। চায়ের কেটলিটা বিকেলে ধুসনি। ভালো করে ধুয়ে রাখিস। আমি চললাম।

ছেলে-বৌ-এর দিকে আর একবারও না তাকিয়েই নলিনী চলে গেলে, খাবার টেবলে বসেই ভৃগু সিগারেট ধরালো একটা।

নলিনীর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে ; গিগি বলল মায়ের গোস্সা হয়েছে। হেভী গোস্সা।

হতেই পারে। কম তো আর বলিনি আমরা।

ভৃগু বললো।

গিগি বললো, ভৃগুর আঙুলের ফাঁকের সিগারেট দেখিয়ে, অ্যাই ! আমাকে একটা দাও তো। এই পায়েস-ফায়েস ভালো লাগে না আমার। এমন স্টিকি জিনিস না ! তার উপর মিষ্টি তো বটেই ; মুখটা বিচ্ছিরি লাগছে পায়েস খেয়ে।

ভৃগু একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলো গিগিকে।

বললো, খেয়ে নাও মা যতদিন আছেন। তার পরে তো ...

দুজনের সিগারেট খাওয়া হলে ওরা শোবার ঘরে গেলো।

শোবার ঘরে গিয়ে খাটে উঠে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে নাইটি-পরা-গিগিকে ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে ক্রিম মাখতে দেখতে দেখতে ভৃগু বললো, নট ব্যাড। কী হলো ? একটা এয়ার-কুলার বেডরুমে থাকলে গরমের দিনেও আদার-টাদর করতে ...

অসভ্য।

গিগি বললো।

তবে প্রবলেমও আছে।

কি ?

ভৃগু উত্তর দিল না ওর কথার।

ড্রেসিং-টেবলের উপরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ভৃগুর পাশে এসে খাটে আধো-শুয়ো গিগি আবারো বললো কি ?

আরে ভি পি সিং যা করছেন না।

কে ভি পি সিং ?

আরে ! ঐ নতুন ফিনান্স মিনিস্টার। রাজীবের জন্যেই হচ্ছে এসব। ব্যাঙ্কে চাকরি করাই এখন মুশকিল। সকলকেই চোর ভাবে এরা। কী অন্যায় বলো তো ? এখন নতুন এয়ার-কুলার লাগালেই চাকরিটা না চলে যায়। আর কুচলি তো করে সব কোলীগরাই। ঐ যে গাঙ্গুলীকে দ্যাখো, ঘোষও ওরা দুজনেই আমার পরম শত্রু। পারলে ফুলকো লুচির মতোই ছিঁড়ে খেতো আমাকে। চাকরি যাওয়া আজকাল কিছুই নয়। তবে ব্যাঙ্কিং-এর কোয়ালিফিকেশন আছে আমার। বিনা কারণে পেছনে লাগলে চলে যাব অন্য ব্যাঙ্কে। মানে, চাকরি যদি চলে যায়।

কেন ? চাকরি যাবে কেন ?

কেন কি ? গেলেই হলো। আজকাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানরাও সেফ নন তায় আমরা। আমি কিন্তু তোমার মেজমামার কাছ থেকে ওসব নিচ্ছিই না। এসব কথা তো তোমার মেজমামাকে বলতে পারবো না।

কি ? সত্যিই নেবে না বলছো নাকি ? সাধা লক্ষ্মি পায়ে ঠেলবে ?

পাগল হলে ? তাছাড়া মেজমামার ফিলিংস-এরও তো একটা দাম আছে। এই বাজারে কে আর কাকে কি দেয় বলো ? স্বার্থ ছাড়া ?

তা বলিনি। বলছিলাম, দেবেন তোমার মামা। নেবে তুমি। এর মধ্যে আমি নেই। উনি যা যা দিয়েছেন এবং দেবেন সবেরই একটা লিস্ট করে ওঁকে দিয়ে সই করিয়ে নেবে। উনিই দিলেন এমনই লিখিয়ে। ওঁর দুম্বরের টাকা আছে হয়তো অনেক। তাই-ই এতো টাকার গরম।

ডাইনার্স-ক্লাব কি দু নম্বর টাকায় ?

গিগি শুধোলো।

ডাইনার্স ক্লাব ? তুমি জানলে কি করে ?

বাঃ। মেজোমামা তো ঐ জন্যেই আইটিডিসি-র ট্যাক্সি নিলেন। সঙ্গে ক্যাশ নেই বেশি। অন্য ট্যাক্সিরা তো ক্যাশ ছাড়া নেবে না। ডাইনার্স ক্লাবের কার্ড দেখিয়ে সই করতে পারবেন। মুক্কির ফরেস্ট লজ-এও ডাইনার্স ক্লাবের কার্ড দেখিয়ে সই করবেন। ঐসব জিনিসও মানে, প্রেজেন্টস বোধহয় ঐ কার্ড দেখিয়েই কিনবেন। নইলে কি আর টুটুর সাইকেলটাও দিয়ে যেতেন না ? সব দোকান তো আর ডাইনার্স কার্ড অনার করে না। জব্বলপুরে তো নয়ই !

ওঃ। তাই-ই ডাইনার্স ক্লাব কার্ড হলে সম্ভবত এক নম্বরেরই টাকা। দু নম্বরওয়ালারা তো সব ক্যাশেরই কারবারী। ভালোই হলে তাহলে। তবুও লিখিয়ে নিতে হবে আমি কোনো ঝামেলায় পড়তে চাই না। ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর বোনঝিকে আরামে আদর করার খেসারতে চাকরিটা খুইয়ে আমি মোটেই দিতে রাজি নই।

হেসে বললো ভৃগু।

ভীষণ অসভ্য তুমি।

গিগি বলল, খুশি খুশি গলায়।

আর কি হবে না কি ? মেমসাহেব ? বড়লোক মামার আদুরে বোনঝি ?

এবারে খুশি খুশি গলায় ভৃগু বললো, গিগিকে।

খুশি খুশি গলায় গিগি উত্তরে বললো : "হউক। তাহা হইলে। লেট আস সেলিব্রেট মেজোমামার ভিক্টরি হিয়ার।"

বলেই দ্রুত হাতে নাইটিটি খুলতে খুলতে হাত বাড়িয়ে বাতির সুইচটা নিবিয়ে দিলো ঘরের। তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললো, দরজাটা তুমি বন্ধ করো উঠে। সবই আমি করতে পারবো না।

সবই আবার কি ? বিরক্ত গলায় ভৃগু বললো। তোমার ভূমিকা তো শবেরই। সব তো আমারই করতে হয়। রোজই।

বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল ভৃগু।

দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, এই যাঃ ! বাটুমা যে এক্ষুনি ইসাবগুল নিয়ে আসবে। কী করব ? আনতে বলবো ?

বিরক্তি গলায় গিগি বললো, তাহলে থাক আজ। আমি শুলাম। এনাফ ইজ এনাফ। অর্ডার মতো সব হয় না। ইচ্ছেই মরে গেলে ...

ঠিক আছে। ঠিক আছে।

বলেই, দরজা দিয়ে গলা বের করে চেঁচিয়ে বললো, ভৃগু, বটুমা অ্যাই বাটুমা। আজ ইসাবগুল খাবো না রে !

বাটুমা রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছিলো সেখান থেকে উত্তর দিতেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো ভৃগু। প্রায়ান্ধকারে ভৃগুর কালো নগ্ন পশ্চাৎদেশকে দুটি বাঁয়ার মতো মনে হচ্ছিলো। গিগির ইচ্ছে হলো, আজ দুহাতেই বাঁয়া বাজায়। আনন্দর দিন।

বাইরের দরজা ?

গিগি উৎকণ্ঠার গলায় বলল।

এই রে ! ও মা বন্ধ করবেন এখন।

ভাচ্ছিল্যের গলায় বললো ভৃগু দুধ-সাদা বিছানার চাদরে ঢাকা খাটের দিকে গুহামানবের মতো অন্ধকারে এগিয়ে আসতে আসতে।

খাটে পৌঁছে প্রায়ান্ধকার ঘরে গিগির আলফ্যানসো আমের মতো গড়নের ও রঙের বুকে, মুখ রেখে ফিসফিস করে আদুরে গলায় বললো,অ্যাই একটা কতা বলব ?

না। এখন কোনো কথাই বোলো না সত্যি। একটা কাজেও তোমার কনসেনট্রেশন নেই। ভালো লাগে না আমার। জীবনে কিছুই হবে না তোমার। যার কনসেনট্রেশন নেই তার ...

খুব নিচু গলায় বললো গিগি। নিঃশ্বাস ফেলারই মতো করে।

বলেই, তার নিজের করমচা-রঙা স্তনবৃন্তে ভৃগুর গরম ঠোঁটের পরশ দিতে নিতে বলল, কি কথা ? হঠাৎ মনে পড়লো ?

ভৃগু বললো, মায়ের সঙ্গে তোমার মেজমামার কি কোনো ?

গিগি একটু ভেবে, বললো, নট অনলাইকলি। মেজমামা আসার পর থেকেই মা কেমন যেন "পজেসড"-এর মতো বিহেভ করছেন। প্রেমে পড়লেই বোধহয় এরকম হয়।

ভৃগু তার নিজের দুহাঁটুর উপরে উঠে বসলো। মনে হলো, এক্ষুনি যেন খাটের উপরে কুম্ভক আসন করবে।

বললো, হাউ ডেঞ্জারাস্। যদি আমার মাকে ইলোপ করে নিয়ে যান ? কনসিকোয়েন্সটা একবার ভেবে দেখেছো ? তোমাকে চাকরি ছেড়ে রাঁধুনি হতে হবে। উড়ে বেড়ানো চলবে না আর এবং বেবী সীটারও। মা আছেন তাই-ই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছো।

আমি একা বেড়াচ্ছি।

না, তা নয়, আমিও।

বড় বাজে কথা বলো। তোমার মায়ের কি আছে এখন আর যে, মেজমামা ইলোপ করেন তাঁকে। মেয়েরা তো পঞ্চাশেই বুড়ি। বিশেষ করে মায়েদের জেনারেশানে। মায়ের তো পঞ্চান্ন হলো তাই না ?

ঐরকমই হবে। বুড়ি, আমরা বুড়ি বানিয়েছি বলেই। দ্যাখো না, মিসেস সেন পঞ্চান্ন বছর বয়সেও কেমন ঢং করেন ক্লাবে ? মিসেস সিনহা ? আমি যদি একবার "হ্যাঁ" করি তাহলে ওরা শুয়েও পড়বেন আমার সঙ্গে। সত্যি।

হাসিও না তুমি আর।

তারপর গিগি, ভৃগুর শরীরের মধ্যভাগে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললো, ওরা ওরা, আর তোমার মা, মা। মা তো আর "অবলোকপ্রাপ্ত" নাকি যেন বলে ; তা নন। শাশুড়ি-মায়েরা নাতি

মানুষ করার জন্যে, বড়ি আর আমসত্ত দেওয়ার জন্যে, ডিল্লিশস সব নিরামিস পদ রান্না করার জন্যেই । মাকে নিয়ে ভয় নেই কোনো । তবে প্রেজেন্টগুলো পেয়ে নিই আগে তারপর মেজোমামাকে স্পষ্টই বলে দেব যে, শর্মা এদিকে আর নয় ।

সেইই ভালো । রিসক নেওয়ার কোনো মানে হয় না ।

বলেই, ভৃগু আবার উপুর হয়ে গিগির সুস্নাত, সুগন্ধি শরীরের উপর হামলে পড়ে দাম্পত্য-কর্তব্যে লেগে পড়লো ।

নলিনীর ঘুম আসছিলো না ।

টুটুটা পাশে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে । বার বার কম্বল ফেলে দেয় ও । কম্বলটা ঠিক করে গায়ে দিয়ে দিলেন । চোখ বন্ধ করলেই শুভাশিসের মুখটা মনে পড়ছিলো । বেলা শেষে একজন মানুষ হঠাৎ এসে যে তাঁর জীবনটা ওলোট-পালোট করে দেবেন এমন করে, তা শুভাশিস আসার আগের দিনও জানতেন না । মানুষের কখন যে কী হয় !

সেদিন বিকেলে হাঁটতে যাচ্ছিলেন শুভাশিস । বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগে, নলিনীর হাতে-সাজা পান খাবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন বারান্দায় । পোশাক পরে । হালকা নীল রঙের কর্ডুরয়ের ট্রাউজার । দুটি হাত প্যান্টের দুটি পকেটে ঢোকানো । গায়ে একটি লাল-রঙা সিল্কের শার্ট । উঁচু-কলারের । আজকালকার ছেলেদের মতো । তার উপরে নেভী-ব্লু-রঙা ব্লেজার । পেতলের ঝকঝকে বোতাম । ব্লেজারের বুক পকেট থেকে একটি লাল-রঙা রুমালের কোণা উঁকি মারছে । চওড়া চোয়ালের মুখটি একপাশে ফেরানো কপাল ঢাকা ঘন চুল । বেশিই পাকা । রুপোলী চুলে বিকেলের নরম রোদ এসে পড়ে সোনালী করে তুলেছিল ।

পান হাতে করে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে তাঁর নুয়ে-পড়া মনের স্তুতি আর শুভকামনা মিশিয়ে শুভাশিসকে না ছুঁয়েও ছুঁলেন নলিনী । একটি গান, হঠাৎ মনে-পড়া রবিবাবুর একটি গান ; তাঁর মস্তিষ্কের গভীরে ফিরে এসেছিলো শিকল ছিঁড়ে উড়ে যাওয়া বহুদিন আগে । পোষা-পাখিরই মতো ।

"রবিবাবুর গান" : নলিনীর বাবা কাকারা ঐরকমই বলতেন । "রবিবাবুর গান," "শরৎবাবুর উপন্যাস" ।

"দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগলো চিতে
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে--
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে" ॥

কী হলো বেয়ান, পান ?

বলেই, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে শুভাশিস নলিনীর মুখোমুখি হয়েছিলেন । অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী হলো বেয়ান ?

পান এগিয়ে দিয়েছিলেন নলিনী । হাতের পাতার সঙ্গে হাতের পাতার ছোঁয়া লেগেছিলো । তাতেই ভালোলাগায় গা-ছমছম করে উঠেছিলো । তাঁর শরীর যেন কিশোরের শরীর হয়ে উঠেছিলো । এবং মনও । কী লজ্জা ! কী ভালোলাগা । একটু হাতের ছোঁয়াতেই !

শুভাশিস বলেছিলেন, পানমুখে দিতে দিতে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন অথচ ডাকেননি ? কী দেখছিলেন ?

নাঃ । এই ! বিকেলটা ভারী সুন্দর । হেমন্তর বিকেল, সুন্দর না ?

একটু চুপ করে থেকে, কমলা-রঙা দিনশেষের আলো-পড়া নলিনীর মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন শুভাশিস । বলেছিলেন, সত্যিই সুন্দর । চোখে সৌন্দর্য্য থাকলে সবকিছুকেই সুন্দর দেখায় । আপনি মানুষটিই যে ভারী সুন্দর বেয়ান । শুধু চেহারাতেই নয়, মনেও ।

লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন নলিনী । তাঁর এতবছরের জীবনে তাঁকে এমন করে একজন পুরুষও বলেননি । স্বামী তো বলেনইনি ! "মানুষটি" কী সুন্দর কথাটি ।

আবারও পাশ ফিরলেন নলিনী । কম্বলটা টেনে নিলেন গায়ে ।

ভাবছিলেন, তিনদিন হয়ে গেছে শুভাশিস গেছেন । চিঠি আসেনি কোনো । আসবে না । জানেন । চিঠি পাওয়ার ভাগ্য তাঁর নেই ।

জ্যোৎস্না একবার বন্ধুদের সঙ্গে পাচমারী গিয়ে তাকে চিঠি লিখেছিলেন ।

নলিনীবালা, পরমকল্যাণীয়াসু।

আশাকরি বাসাস্থ সকলের কুশল। খোকা কেমন আছে ? প্রতিদিন তাহাকে কালমেঘের রস খাওয়াইতে ভুলিও না।

এই স্থানটি নিতান্ত মন্দ নহে। বেশ ঠাণ্ডাও। আনাজপত্রাদি যথেষ্ট সস্তা। মাছও যে পাওয়া যায় না এমন নহে। তবে আমরা মুরগী খাইতেছি প্রত্যহ। যোগেশকে লইয়া বড়ই বিপদে আছি। তাহার অর্শ বড়ই পীড়া দিতেছে। নবীন একটু কবি প্রকৃতির। সে সর্বদাই খাতা-কলম লইয়া কবিতার মস্ত্রো করিতেছি। লক্ষণ যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় তাহার শীঘ্রই বিবাহ দিতে হইবে। অবশ্যই যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করিয়া। এই কাব্য-রোগই বাঙালীর কাল হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙালীকে ধরিয়া, ব্যবসাদার উদ্যোগী কর্মবীর মাড়োয়ারবাসীদের পশ্চাৎদেশ হইতে সিরাম সংগ্রহ করিয়া ইনজেক্ট করিতে পারিলে এই হতভাগ্য জাতির সমুদয় দুর্দশা দূর হইতো। কিন্তু এই কঠিন কর্ম সুসম্পন্ন করিবার যোগ্যতা রাখেন এমন বাঙালী তো একজনও দেখিনা। উদ্যম বলিয়া আমাদের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই।

তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবা। সাবধানে থাকিবা। কুন্তী এবং জতনুকে কহিবা, কোনো পুরুষ যেন অন্দরে প্রবেশ না করে। দিনকাল আদৌ ভালো নয়।

--ইতি আঃ জ্যোতিষ ''

এই চিঠিটিই তাঁর জীবনের একমাত্র চিঠি স্বামীর কাছ থেকে। শুধু স্বামীই বা কেন, কোনো পুরুষের কাছ থেকেই। বাবার এবং তাঁর পুত্র ভৃগুর কথা বাদ দিলে। তাও বাবা তো বিয়ের পর মাত্র কয়েক বছরই বেঁচে ছিলেন।

যদি শুভাশিস লেখেন আদৌ, তবে কী লিখবেন নলিনীকে ? কেমন করে লিখবেন ? এইভেবেই ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছেন এ-ক'দিন। সব সময়ই।

সত্যি সত্যিই কী আর লিখবেন ? ও শুধু কথারই কথা।

ছিঃ। ছিঃ। এ গর্হিত অপরাধ। রাত জেগে এসব কী ভাবছেন নলিনী ?

জ্যোতিষ রায়ের বিধবা স্ত্রী, ভৃগু রায়ের মা, গিগির শাশুড়ী পাড়ার বউ-মেয়েদের মাসিমা, ছোট টুটুর ঠাম্মা, তিনি এ কী করছেন ?

পাশের বাড়িতেই আছেন চ্যাটার্জী-গিন্নী। তাঁরই মতো, তিনিও বিধবা। এক ছেলে, বৌ এবং এক নাতি। তাঁকে দেখে কিন্তু মনে হয় যে, তিনি তাঁর জীবন নিয়ে ভীষণ তৃপ্ত। তাঁর স্বামীর ফোটোতে দুবেলা নিজে হাতে মালা গেঁথে পড়িয়ে দেন। নলিনী পারেন না। দেখাবার জন্যেও পারেন না। তবুও এতদিন বাইরে থেকে যে-কেউ নলিনীকেও ঐরকমই ভাবতেন, মানে চ্যাটার্জী গিন্নীরই মতো। তখন ...

মানুষটা মানে, নলিনীর স্বামী জ্যোতিষ রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে শরীর এবং মনের প্রায় কোনো চাহিদাই মিটিয়ে যাননি নলিনীর। এতদিন পরে পিছন ফিরে তাকালেন বলেই তাই-ই বোঝেন। এক ধরণের যন্ত্রই ছিলেন মানুষটা ; মানুষের মতো নয়। তবুও মৃত স্বামী শ্রদ্ধাশীল না হতে পারায় এবং গিগির মামা শুভাশিসের প্রতি এই হঠাৎ এক ধরণের মমত্ববোধ করতে থাকায় এক ধরণের গভীর অপরাধবোধেই জর্জরিত হচ্ছিলেন নলিনী। এও বড় কষ্টের। মানুষমাত্রই বড় কষ্ট। খাওয়া-পরার কষ্টটাই মানুষের একমাত্র কষ্ট নয়।

রানী দুর্গাবতী কলেজের পেটা-ঘড়িতে রাত একটা বাজলো। দূর থেকে ভেসে এলো সেই আওয়াজ। নর্থ সিভিল লাইনস, সাউথ সিভিল লাইনস সবই ঘুমিয়ে পড়েছে। গভীর ঘুম এখন শহরে। মাঝে মাঝে পীচ রাস্তায় টায়ারের প্যাচ-প্যাচ আওয়াজ তুলে হুশ-হাশ করে দূর যাত্রী ট্রাক যাচ্ছে পীচ রাস্তা দিয়ে। রাতে ট্রাক হর্ন বাজায় না। কেন, কে জানে ! মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘন্টার শব্দ শুনে গড় আনার এই বীর নারীর, যিনি আফগান নবাব বাজবাহাদুরকে গো-হারান হারিয়ে দিয়েছিলেন সেই রানী দুর্গাবতীর কথা মনে হয় নলিনীর। উনিও এক ধরণের জীবন কাটিয়েছিলেন, আর নলিনীও কাটালেন তাঁর জীবন।

কত্ত অন্যরকম।

॥ ৪ ॥

শ্যামলীদের বাড়িতে ডেসেন্ড করতে গেছে টুটু। ভৃগু আর গিগি ক্লাবে গেছে। কিসের যেন একটা ছুটি আছে আজ।

কিসের ছুটি, তা নিয়ে আর মাথা ঘামান না নলিনী আজকাল। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট, স্টেট গভর্ণমেন্ট, কমার্শিয়াল ফার্মস, ব্যাঙ্ক এসব বন্ধ থাকলেও ওঁর কিছু মাত্রই যায় আসে না। নলিনীর অফিস খোলাই থাকে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত। তাঁর কোনো ছুটি নেই। সপ্তাহে একদিনও না। বন্ডেড-লেবারেরই মতো।

গিগিরা ক্লাবেই খেয়ে আসবে বলেছে লাঞ্চ। " হাউজি" খেলা হবে নাকি সেখানে। ওরা বলছিল। আর বীয়ার খাওয়া। টুটর জন্মদিনে একবার এই বাড়ির বাগানেও হয়েছিলো হাউজি-খেলা। ছড়া কেটে কেটে একজন বল্লেন, " টু ফ্যাট লেডিস এইট্টি-এইট "। " সিক্স এন্ড ফোর সিক্সটি ফোর," এই রকম।

ওদের ক্লাবে নাকি টিকিট কেটে খেলতে হয়। টাকা দিয়ে। প্রাইজ-টাইজও পায় ওরা।

ওরা খাবে না, তাই শুধু বাটুমা আর নিজের জন্যে আজ বেশি ঝামেলা করেননি। একটু সিদ্ধ ফুটিয়ে নিয়েছিলেন। আলু আর কুমড়ো ফেলে দিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েছিলেন হাতে একটি বই নিয়ে। লাইব্রেরী থেকে শ্রাবণী এনে দিয়েছে কাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দূরবীন। ধারাবাহিকভাবে পড়েছিলেন অবশ্য 'দেশ'-এ। ভালো বই বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। তাছাড়া, একসঙ্গে পড়ার আলাদা আনন্দ।

ঘন্টাখানেক পড়ে, ভাবলেন, একটু শুয়ে নেবেন চা যতক্ষণ না হয়। চোখদুটি আজকাল অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বিকেলের চা-টা অবশ্য বাটুমাই করে। এনে দেবে ঘরেই।

নির্জন দুপুর। বাগানে পাখিরা ওড়া-উড়ি করছে। তাদের তীব্র এবং মৃদু ডানার ঝাপটানির শব্দ কানে আসে। ডালিয়ে আর চন্দ্রমল্লিকার ডাঁটি ভেঙ্গে দেয় কোনো দূরন্ত পাখি। পাখিরা সুন্দর হলে কী হয়, অনেক সুন্দর জিনিষেরই প্রতি ওদের গভীর ঈর্ষা আছে অনেক সুন্দর মানুষেরই মতো। খারাপ লাগে। সেইসব ফুল-ছেঁড়া মুহূর্তে বড়ই একা মনে হয় নিজেকে মনে হয়, আত্ম হত্যা করেই মরে যাবেন একদিন। ঘুমের ওষুধ-টষুধ খেয়ে একমুঠো। এরকম ডিপ্রেসন ফিরে ফিরেই আসে আজকাল। আসে যেমন, তেমন কিছুদিন পরে নিজ থেকেই আবার চলে যায়। ডাক্তার বলেছিলেন, "মনোপজ"-এর জন্যেই নাকি এমন হয়। কিন্তু সে তো অনেক বছর আগের ঘটনা। তাছাড়া, যিনি স্বামী-হীনা, তাঁর কাছে ঐ একদিন ঘটনার ভূমিকাও তো খুব একটা বড় নয়। তাহলে এখনও কেন এমন হয় কে জানে?

ঘুমিয়ে ছিলেন নলিনী যখন বাটুমা এসে ঘুম ভাঙ্গালো। বাইরে বেলা তখন একেবারেই পড়ে এসেছে। একদল ছাগল নিয়ে একজন বুড়ো ছাগল-ওয়ালা রোজই এই সময় রানী দুর্গাবতী কলেজের দিক থেকে নর্থ সিভিল-লাইনস-এর দিকে যায়। ছাগলদের গলার ঘন্টা আর হালকা খুরের খটাখট শব্দ শুনে নলিনী বোঝেন যে, এখন সাড়ে চারটে বাজে। ওরা পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেলেই বাগানের ড্যক্যালিপটা গাছেদের ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে আসে। তারপরই ঝুপ করে রাত নেমে আসে।

উঠে বসে, হাই তুললেন একটু আলসভার, উদ্দেশ্যভরে, উদ্দেশ্যহীনভাবে বাগানের দিকে চেয়ে।

বাটুমা বললো, দুটে চিঠি এসেছে মা!

চিঠি?

নলিনীর সদ্য ঘুম-ভাঙ্গা বুকটা ধ্বক করে উঠলো। আজকাল এমন-হঠাৎ ধাক্কা লাগলে; সে সুখেরই হোক, কী দুঃখের হোক অনেকক্ষণ নিয়ন্ত্রণহীন বুকটা ধক ধক করতে থাকে। মনে হয়, বুকের মধ্যে যেন এঞ্জিন চলছে একটা। অথচ তা বন্ধ করার সুইচ যে কোথায় তা তাঁর জানা নেই।

তাড়াতাড়ি চশমাটা পড়ে নিয়ে দেখলেন। একটি চিঠি গিগির। ওর কোনো বান্ধবী লিখেছে ইংল্যান্ড থেকে। অন্য চিঠিটি নলিনীরই। হ্যাঁ। সত্যিই নলিনীর। সুন্দর গোটা কিন্তু কাটা কাটা অক্ষরে নলিনীর নাম লেখা।

বাটুমার সামনে কোনোরকম উত্তেজনাই না দেখিয়ে নলিনী বললেন, চা'টা বানা তুই, আমি বাথরুম থেকে আসছি।

বাথরুমে গিয়ে বেসিনের সামনে আয়নাতে নিজের মুখটা একবার দেখলেন উনি। অনেকক্ষণ ধরে। আলো জ্বালিয়ে। ভালোবেসে। আলো জ্বালালেন, বাথরুমের প্রায়ান্ধকার তাড়াতে, এমনিই; যদিও তখনও সময় হয়নি আলো জ্বালার। গ্লিসারিন সাবান দিয়ে মুখটা

ধুলেন। চোখে বার বার জলের ঝাপটা দিলেন ভালো করে। নিজেই নিজেকে বললেন বাথরুমের আয়নাকে সাক্ষী রেখে ; বাঃ। বেশ তো আছে এখনও মুখটি ! চোখ দুটি এখনও উজ্জ্বল। বসন্ত চলে যাওয়ার দাগ তো এখনও পড়েনি এ মুখে ! সত্যিই খুশি হলেন খুবই নিজেকে দেখে। আসলে, নলিনী বোধ হয় বুড়ি হননি, তাঁর অনুষঙ্গ ও পরিবেশই বুড়ি করে রেখেছে তাঁকে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অতি যত্নে কাঁচির একটি পাশ দিয়ে খুললেন চিঠিটাকে। চিঠি খোলার মতো কিছুই নেই তাঁর ঘরে। চিঠি যাঁদের রোজই আসে, তাঁদের কাছেই লেটার-ওপেনার টোপেনার থাকে।

মুক্তি সাফারি লজ
মঙ্গলবার

শ্রীমতি নলিনী রায়,
"জ্যোতিষালয়,"
পাচপেড়ি,
সিভিল লাইনস্ জব্বলপুর,
বেয়ান কল্যাণীয়াসু,

এখন অনেক রাত। নিচ দিয়ে বান্জার নদী বয়ে যাবার ঝরঝর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চাঁদহীন আকাশে আকাশ-ভরা তারা। চিতল হিরণের ঝাঁক অন্ধকার সাঁতরে উড়ে যাচ্ছে এক বন থেকে অন্য বনে।

আজই তো পৌঁছলাম এসে সন্ধ্যেতে ! অনেকই ঘোরা-পথে আসতে হলো। জানাই ছিলো না যে, কান্হার পার্ক পয়লা অক্টোবরের আগে খোলে না। প্রথমে তো মান্দলা হয়ে ইন্দ্রাতে গিয়ে দেখি যে, হাঁলো নদীতে কালো জল বইছে। গাড়ি ঘুড়িয়ে অনেকই পথ ঘুরে চিল্পি হয়ে তারপর পৌঁছিলাম এসে। একমাথা ধুলো এবং এক শরীর ক্লান্তি নিয়ে।

পার্ক যে কবে খোলে, ভৃগুর আর গিগির এই খবরটা জানার কথা ছিলো। অথচ জানে না। এখানকার ছেলে-মেয়েরা নিজেদের জীবিকা আর শখের বিষয় ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়েই বিশেষ খোঁজ-খবর রাখে না। অথচ অন্য রকম হওয়ারই কথা ছিলো।

পার্ক খোলার মাস খানেক পরে এলেই ভালো হতো এখানে। এখনও জঙ্গলের গভীরে সব জায়গায় যাওয়া যায় না। গভীর আন্ডারগ্রোথ রয়েছে চারপাশেই। ভৃগুর কিন্তু এই খবরটা সত্যিই রাখা উচিৎ ছিলো।

অথবা কে জানে ! আমি বুড়ো হয়েছি বলেই হয়তো অল্প-বয়সীদের অনেক কিছুই এখন আমার চোখে খারাপ ঠেকে। বুড়ো হয়েছি ; এই মনোভাবই হয়তো তা প্রমাণ করে।

বেশ কাটলো বেয়ান সাত'টা দিন। সৎসঙ্গে। আপনার আদর-যত্ন, গিগি আর ভৃগুর খাতির। বাটুমার নিবেদিন-প্রাণ সেবা। গিগিও মা হয়ে গেলো ! সে-ও চাকরী করে। তার ছেলেরও বয়স হয়ে গেলো চার। এরপরও আমরা বুড়ো যে হইনি এ-কথা বলি কী করে ?

কিন্তু বুড়ো আমার একেবারেই হতে ইচ্ছে করে না। শরীরেও নয় ; মনেও নয়। তবে এপই বয়সটাকে আবার বেশ ভলোও লাগে। জীবনের অনেক ক্লেদাক্ত চাওয়া, আশা এবচ প্রার্থনার হাত থেকে পুরোপুরিই মুক্ত হয়ে ধুলিমলিন প্রাত্যাহিকতার জীবটাকে অনেক দূরে এবং পেছনে ফেলে এসে ধুলোপায়ে হেঁটে কোনো পাহাড় চূড়োর উপর থেকেই যেন তাকে দেখা যায়। তার অসারতাকে, দৈনন্দিনতার তুচ্ছতাকে ও স্থূলতাকেও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে এখন। স্বাচ্ছল্য আর সুখ যে এক নয়, গার্হস্থ্য আর জীবন যে এক নয় এসবই যেন এখন দূরের জীবনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারি। এই পাহাড় চুড়ো থেকে সেই কল্পনার আসল জীবনকে জীবনের প্রকৃত স্বরূপকে বিদেশি ক্যালেন্ডারের ছবিতে-দেখা অবাস্তবভাবে-সুন্দর কোনো কুয়াশা-ভেজা উপত্যাকারই মতো মনে হয়। যা পেরিয়ে আসি, ফেলে আসি আমরা : তাই-ই বোধ হয় ছবি হয়ে যায়। নইলে ফোটে। সুন্দর জীবন, প্রিয়জন ; অতীতের সুখস্মৃতি। সব কিছুই।

সীমার, আমার বিরুদ্ধে অনেকই অভিযোগ ছিলো। তার অনুযোগের অনেকখানি সত্যিও ছিলো। আমি মানুষটা, কোনোদিনই ভালো স্বামী বলতে যা বোঝায় : তা ছিলাম না। সংসারী তো নইই। অন্য দশজন সাধারণ স্বামী যা করে, অফিস থেকে তাড়তাড়ি ফিরে ভালো করে চান করে, দাড়ি কামিয়ে আফটার সেভ লোশান আর ওডিকোলম মেখে, গায়ে লাল-সিল্কের হাওয়াইন

শার্ট চাপিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ক্লাবে, বা রেঁস্তোরায় বা "বন্ধুদের" বাড়ি যায়, তা আমি কখনওই করতে পারিনি। হিঃ-হাঃ-হাঃ-হিঃ করে সেই পুরোনো একঘেয়ে মুখগুলির সামনে বসে রোজই একই কথা, একই প্রসঙ্গ, একইরকম পরনিন্দা-পরচর্চা করে নিজের নষ্ট সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হয়নি। অথচ এখন ভাবি, সীমা যখন চাইতো তখন অন্য দশজন আদর্শ বাঙালী স্বামীরই মতো আমিও ওকে খুশি করার জন্যেও তো মাঝে মাঝে অমন করলেও পারতাম !

এখন ভাবী।

সীমার বিরুদ্ধেও আমার যে কোনো অভিযোগ ছিলো না এমন নয়। তবে সে অভিযোগ নিয়ে আলোচনার সময় আজ আর নেই। যে মানুষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে একটিও খারাপ কথা বলা উচিত নয়। ঔচিত্যের কথা ছাড়াও ; আশ্চর্যর কথা, তার ভালোটুকুই শুধু মনে পড়ে আজকে। খারাপ যে কিছুমাত্রও ছিলো, এখন আর তা মনেই পড়ে না। এইটে ভেবেই খুব ভালো লাগে। আশ্বস্তও লাগে। মনে হয়, পাপ যদি কিছু জমে থাকে এ বাবদে, তবে সেই পাপের কিছুটা বোধ হয় ক্ষালন হলো।

সবচেয়ে মজার কথা কি জানেন বেয়ান ? সীমা চলে যাওয়ায় এখন বুঝতে পারি যে, এই বিপুল পৃথিবীতে যার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারি এমন একটি মানুষও আজ আর নেই। একটুও না-ভেবে দুম্-দাম্ করে কত কথাই না বলছি তাকে। কাঁদিয়েছি, আঘাত দিয়েছি ; বঞ্চিত করেছি। আর ভেবেছি, ওতো আমারই। ওকে নিয়ে আমি যা-খুশি করতে পারি। ভালোবাসার প্রকাশ একেকজনের একেক রকম। সেই রকমটা বুঝতে বুঝতেই ফিরে যাবার সময় হয়ে যায়। একে অন্যকে বোঝা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না।

আজ এখানেই শেষ করি। কাল আবার লিখব। উত্তর দেবেন কিন্তু। দু'দিন লাগবে চিঠি আসতে। উত্তর না পেলে খুবই আঘাত বোধ করব। আমি কাউকে চিঠি লিখেছি অথচ তাঁর উত্তর পাইনি এমনটি হয়নি কখনওই। উত্তর না পেলে, আমার অভিমানে লাগবে খুব।

ভালো থাকবেন।

ইতি --

আপনার রূপ ও গুণমুগ্ধ

শুভাশিস

চিঠিটি কোলের উপর রেখে অনেকক্ষণ বসে রইলেন নলিনী। কখন যে অন্ধকার হয়ে এলো, বাটুমা আলো জ্বালালো ঘরে ঘরে তা টেরও পেলেন না উনি। অন্ধকার ঘরে শাপগ্রস্তার মতো বসে রইলেন উনি।

বাটুমা চা নিয়ে ঘরে এসে বললো, এ কী ! আলো জ্বালাননি কেন মা ? বলেই, সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে আবারো বললো, এ কী ! কী হয়েছে আপনার ?

কি ?

চমকে উঠে নলিনী বললেন। কই ? কিছু না তো ?

বললেই হবে ? আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ?

না তো ! শরীর কেন খারাপ হবে ?

তবে ? ছ'টা বেজে গেলো, ভাঁড়ার বের করলেন না এখনও। দাদা-বৌদিরা তো এসেই যাবে এক্ষুনি। জলখাবার বানাতে হবে না ?

ক্লান্তি ও বিরক্তি মিশ্রিত গলায় নলিনী বললেন, চপ তো গড়েই রেখেছি সকালে। এলেই ভেজে দেবো। টুটুর দুধটা গরম করে দিস টুটু এলেই। আজকে কিছু করতে ভালো লাগছে না আমার।

তার মানেই শরীর ভালো নেই। আমার কাছে লুকোতে পারবেন ?

ভয়ার্ত চোখে চাইলেন নলিনী বাটুমার দিকে। সত্যিই কি ধরা পড়ে গেছেন ? ছিঃ ! ছিঃ ! শরীর কি সত্যিই খারাপ হলো তাঁর ? মন ? মন খারাপই বা হবে কেন ? আসলে তিনি তো খুবই আনন্দিত এই মুহূর্তে। কে জানে ? কিছু কিছু আনন্দ বোধ হয় দুঃখের চেহারা ধরেই আসে।

চা খাবেন ? মা ? আর ?

খাওয়া এক কাপ। আদা দিয়ে কড়িস। গ্লাসে করে বানিয়ে নিয়ে আয়। গরম থাকবে অনেকক্ষণ।

অন্য মনস্ক গলায় বললেন।

পান খাবেন না ? নিয়ে আসব পানের বাটা ?

নাঃ থাক। ভালো লাগছে না। আমি একটু শুই।

পানের কথাতে শুভাশিসের কথা মনে পড়ে গেলো। ওঁকে দিয়ে খেলে বেশি ভালো লাগতো। থাক।

বাটমা চলে গেলে, চিঠিটাকে সযতনে বালিশের নিচে রেখে আবার শুয়ে পড়লেন নলিনী কম্বলটা গায়ের উপরে টেনে নিয়ে। সত্যি শারিরীক অসুস্থতায় আপরগ হাওয়া ছাড়া তাঁর জীবনে প্রথমবারের মতো এই সংসারের দাবী তিনি অস্বীকার করলেন। তেত্রিশ বছরে এই-ই প্রথমবার।

যা হবার হোক, যা পারে ওকে করুক। উনি কারও বাঁদী নন। শরীরই কি সব মানুষের ? মনও কি খারাপ হতে পারে না কখনও ? আজ নলিনী শুয়ে শুয়ে শুধুই ভাববেন।

তাঁকে তাঁর নিজের জন্যে একজন মানুষও ভালোবাসেনি এই পৃথিবীতে। এই সাঁঝবেলাতে এসে নিজেকে নিজের নিজস্বতায় আবিস্কার করতে চান তিনি। অন্যরা আদর করার পুতুল হয়ে, রাঁধুনী হয়ে, আয়া হয়ে যে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন সেই জীবনের হাত থেকে কোনোভাবে মুক্ত হওয়া যায় কী না তা নিয়েই ভাববেন উনি। এই হিমবাহর মতো জীবনের শুধুমাত্র এক-অষ্টমাংশ প্রকাশ করে, অনুভব করেই জীবনেরই জলে ভেসে বেরিয়েছেন এতদিন। এবারে বাকি সপ্তমাংশ উপরে টেনে তুলে তার চেহারাটার আসল প্রকৃতি জানবার, বোঝবার সময় হয়েছে। তিনি জ্যোতিষ রায়ের বিধবা, ভৃগু রায়ের মা, গিগি রায়ের শাশুড়ি, এমন কি টুটু রায়ের ঠাকুমাও নন। এইসব পরিচয় ছাড়াও তাঁর অন্য এক পরিচয়ের উন্মেষ হয়েছে এখন। আজ নলিনী নিজের। শুধমাত্রই নিজের। এই নলিনী। একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

বাটুমা, চা নিয়ে এলে, বললেন, আলোটা নিভিয়ে দে। আর ওরা এলে, তুই-ই যা-পারিস করিস রাঁধা-বাড়া। রাতে কি খাবে ওরা জিজ্ঞেস করে যা হয় তুই-ই রেঁধে দিস। আমাকে যেন বিরক্ত না করে কেউ। এ ঘরে যেন না আসে। টুটুকেও আজকে ভৃগু-গিগির ঘরেই ওদের সঙ্গেই শুতে বলিস। ওর বালিশ আর কম্বল-টম্বল নিয়ে যা এই ঘর থেকে।

বাটুমা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো, ওদের বলিস যে ওদের কাছ থেকে এই একটা সন্ধ্যে ছুটি নিলাম আমি। তুইও তো ছুটি নিস মাঝে-মাঝেই বাটুমা। সিনেমা দেখতে যাস। যাত্রা দেখতে যাস। আমি কি একবেলাও ছুটি নিতে পারিনা রে ? বল ?

নলিনীর দু-চোখ জলে ভরে এলো। কিন্তু আবেগের অন্য কোনো বহিঃপ্রকাশ হলো না।

নলিনীকে দেখে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লো বাটুমা। বললো, ছিঃ ছিঃ এ কী বলছেন আপনি মা। আমি তো চাকর আর আপনি হলেন মালকিন্। সবচেয়ে বড় মালকিন এ বাড়ির।

না রে। আমিও তোরই মতো। তোর চেয়েও বেশি চাকর আমি এই সংসারের। আমি ঝি। তোর ঝি। চাকরদেরও ঝি আমি।

নলিনীর গলা জড়িয়ে এলো শেষের দিকে। মুখটি জানালার দিকে ফিরিয়ে নিলেন লজ্জিত হয়ে। ছিঃ। ছিঃ। বাটুমার কাছে .....। চেয়ে রইলেন বাগানের দিকে। যেখানে ফুল ফোটে, পাখি গায়, প্রজাপতি ওড়ে ; যেখানে রোদ-চাঁদ খেলা করে। দম বন্ধ লাগে না যেখানে।

বাটমা বললো, থাক, থাক। আপনি বিশ্রাম করুন মা। টুটুর বিছানা নিয়েই যাচ্ছি আমি।

ঘরে ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বললো, দরজাটা কি ভেজিয়ে দেবো ?

দে। না-হয় থাক। আমিই উঠে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি একটু পরেই। কেউই যেন বিরক্ত না করে আমায়। বলে দিস। দরজা ধাক্কালেও আমি আজ কিছুতেই খলবো না। আজ আমার ছুটি।

বাটুমা ধীর পায়ে বেড়িয়ে গেলো। যাওয়ার সময়ে বললো, একটু পরে এসে চা-এর গ্লাসটা নিয়ে যাবো। রাতে কি খাবেন মা ?

কিছুই খাবো না আজ। তুই শুধু এক বোতল জল এনে রাখিস টেবলে।

সে কী। না খেলে যে শরীর আরো খারাপ হবে।

কথা বলাস না আমাকে বাটুমা। আমাকে একটু একা থাকতে দে।

ঠিক আছে।

বলেই চলে গেলো ও।

অন্ধকার ঘরে বসে বালিশে হেলান দিয়ে বাগানের দিকে চেয়ে রইলেন নলিনী।

কৃষ্ণচূড়া গাছটা মস্ত বড় হয়ে গেছে। উনিই লাগিয়েছিলেন কুড়ি বছর আগে। পথের আলো এসে পড়েছে তার ডালে পাতায়। দুটো পেঁচা ঝগড়া করতে করতে উড়ে গেলো দূরে। পথ দিয়ে অ্যাম্বাসাডর গাড়ি গেলো একটা। তার যাত্রীদের উচ্চগ্রামের কথাবার্তার টুকরো-টুকরো ছিটকে এলো ভিতরে। বোঝা গেল না কী বললো তারা।

নলিনী ভাবছিলেন, জীবনেও এরকম হয়। কথা বলা হয় সর্বক্ষণই। কিন্তু তার কম কথাই বোঝা যায়।

অথচ শুভাশিসের এই চিঠিতে কত সুন্দর সব কথা ভাবনা বয়ে আনলো তাঁর কাছে। এমন করে, এমন সব কথা কেউই বলেনি তাঁকে আজ অবধি। কথা যে এমন করে বলা যায়, তা জানতেনও না পর্যন্ত তিনি। শুভাশিস এসে, চলে গিয়ে ; চিঠি লিখে তাঁর জীবনটার অসাড়তা সম্বন্ধে তাঁকে বড়ই সচেতন করে তুলেছেন।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে শুয়ে শুয়েই এক সময় বাইরে গাড়ির শব্দ শুনলেন। ক'টার সময় তা জানার উৎসুক্যও ছিল না তাঁর। অবোধ শিশু, টুটু ; ঠাম্মা ! ঠাম্মা ! করে দু'বার দরজাতে ধাক্কাও দিয়েছিলো। গিগিও হয়তো তাই-ই ছিলো তার মায়ের কাছে। নলিনী নিজের জীবন দিয়েই জেনেছেন যে, একদিন এই টুটুও ভুণ্ড হয়ে উঠবে। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই তার বাবা ঘুমিয়ে থাকে জেগে ওঠার অপেক্ষায়। স্বার্থপর, ধুরন্ধর, শুধুমাত্র নিজের এবং নিজের স্ত্রীর সুখ-বিলাসী হয়ে উঠবে টুটুও। এসব জানা হয়ে গেছে পুরোপুরিই নলিনীর। তবুও শিশুকে কষ্ট দেওয়া যায় না ; দেওয়া উচিত নয়। ওদের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। ওরা সব নীচতা, দীনতা, কদর্য সব সাংঘাতিক রাজনীত এবং চক্ষুলজ্জাহীনতার একবারেই বাইরে। টুটুর বিরুদ্ধে এখনও অনুযোগ নেই নলিনীর।

ওদের বাড়ি ফেরার আওয়াজ মরে গেলে উনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু ঘুমবার আগে চোখের জলে তাঁর দু'পাশ ভিজে গেছিলো। এত জল তাঁর চোখে যে কী করে লুকিয়ে ছিলো ভেবেই পাচ্ছিলেন না নলিনী। তাঁকে সকলেই ভালো-স্বভাবের মানুষ বলেই জানে। তিনি নিজেও তাই-ই জানতেন। তবু তাঁর এই পাথর-চাপা বুক কী করে যে গলে গেলো ! শাপগ্রস্তা অহল্যারই মতো প্রস্তরীভূতা হয়ে ছিলেন যেন এতদিন। রামচন্দ্রর পদাঘাতে তিনিও আবার এক জীবন্ত নারী হয়ে উঠলেন !

ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন তার গভীর। বাইরে মিশ্র শব্দ থেকেই তা বুঝলেন একটি কুকুর কঁকিয়ে কাঁদছে দূরের মোড়ে। অথচ মনে হচ্ছে যেন কাঁদছে ঘরের মধ্যেই। গাঁজায় দম দিয়ে মুরলী পাগলা তুলসীদাস আবৃত্তি করতে করতে খড়মের ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ করে একা হেঁটে যাচ্ছে তার ঝুপড়ির দিকে রাতের শিশির ভেজা রাস্তা বেয়ে।

নলিনী উযে টেবল লাইট'টা জ্বালালেন। টুটুর লেখাপড়ার জিনিস থাকে কিছু ও ঘরে। ওর পেনসিলের বাক্স হাতড়ে একটি লাল-রঙা ফেল্ট-পেন পেলেন। তাঁর লেখালেখির মধ্যে এখন বাজারের আর ধোপার হিসেবই একমাত্র। তাঁর সেই খাতা ও পেনসিল আবার থাকে বসবার ঘরের টেবলেরই ড্রয়ারে। ভুণ্ড একটা ডায়ারী দিয়েছিলো অবশ্য তিন বছর আগে। সেটা ঘরে ছিলো। এই সবই নিজের মাসিক উবৃত্ত পঞ্চাশ টাকা থেকেই। সেই ডায়ারীরই একটি পাতা ছিঁড়লেন। ঘরে খাম ছিলো না। ইনল্যান্ড এবং পোস্টকার্ডও নয়। দেখা, যাবে কাল। বাটুমাকে দিয়েই গতি করতে হবে, নলিনী লিখলেন:

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি আজই বিকেলে পেলাম।

উত্তর না পেলে রাগ করবেন লিখেছেন তাই-ই উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু আমি যে লিখতে পারি না ! যে-মানুষ নিজেকে কোনোভাবেই প্রকাশ করেনি কারো কাছেই বহু-বহু বছর, তার প্রকাশ ক্ষমতাই যে নষ্ট হয়ে গেছে।

আপনি কী সুন্দর লেখেন ! আপনার চিঠি পড়ে মনে হয় আপনি যেন কবি বা সাহিত্যিক। অন্য কোনো কবি-- সহিত্যিকেরই চিঠি আমি কখনও পাইনি। চোখেও দেখেছিলাম শুধু, প্রবোধ সান্যাল মশাই এবং বনফুলকে। ওঁরা একবার এসেছিলেন এখানের বাঙালীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনেক বছর আগে।

আমি লিখতে পারি না। শুধু ভাবতে পারি। গাইতে পারতাম একটু-আধটু। তাও তো গানও প্রায় ভুলেই গেছিলাম। আপনিই এসে তা আবার গান টেনে বার করলেন আমার গভীর থেকে।

অনেক গানই শুনতে চেয়েছিলেন আপনি। তার সামান্যই শোনাতে পেরেছিলাম আমি। এবারে ফিরে এলে, একটি একটি রবিবাবুর এবং একটি নিধুবাবুর গান আপনাকে শোনাবো, ঠিক করে রেখেছি।

রবিবাবুর গানটি নিশ্চয়ই শোনা আপনার। তবে নিধুবাবুর গানটি না শুনে থাকতে পারেন। বাবার বন্ধু হিদে কাকা (হৃদয় বসু) ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এই গানটি প্রায়ই গাইতেন।

" তবে প্রেমে কী সুখ হতো "
আমি যারে ভালোবাসি
সে যদি ভালোবাসিত।
তবে প্রেমে কী সুখ হতো ॥
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে
কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে
ইক্ষুতে ফল ফলিত।
তবে প্রেমে কী সুখ হতো ॥
প্রেম সাগরের জল
তা হলে তো শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল
তাহে যদি না থাকিত।
তবে প্রেমে কী সুখ হতো ॥"

আর রবিবাবুর গানটি হলো :

" কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জানো না হে, তুমি জানো ॥
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে
কিসে মোহিল মন প্রাণ,
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥"

নিধুবাবুর গানটি টপ্পাই। কিন্তু ঠংরী [illegible] গাওয়া হয়ে থাকে। রবিবাবুর গানটি নিশ্চয়ই শুনেছেন।

গানকে তো কবিতার মতো করে লিখে দিলে বোঝা যায় না, তাকে গলার সর আর স্বর আর হৃদয়ের মন্ত্র দিয়ে গেঁলে পরিবেশন করতে হয় সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে।

ফিরে এলে শোনাব যতটুকু সুর ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্য আমার এখনও বাকি আছে, তা দিয়ে। এ ছাড়া আপনাকে দেওয়ার মতো আর কিছুই তো আমার নেই!

বেয়াই মশাই, যখন সকাল মুকুল ঝরে গেছে, যখন সাঁঝবেলাতে সুরের সঙ্গে সুর আর মেলে না, তখনই গান গাইবার ফরমাশ নিয়ে এলেন আপনি। এখন .....

ভালো থাকবেন। নিজের শরীরের যত্ন নেবেন। আপনার মতো মানুষকে অনেক মানুষেরই দরকার। আপনি যেখানে যাবেন, যার পর্ণকুটীরে পা দেবেন সেখানেই স্বর্গের সুবাস ফুটবে ; ফুল ফুটবে। অন্যেকে সুখী ও আনন্দিত করার মতো দুর্লভ ক্ষমতা তো ঈশ্বর সবাইকে দেন না। আপনি নিজের জন্যে যদি নাও দীর্ঘজীবন চান, আমাদের মতো অগণ্য মানুষের জন্যেই আপনাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে। আপনার মতো মনুষের মালিকানা আপনার নিজের একার কখনওই নয়। পৃথিবীর সব ধনী-দরিদ্র সুখী-অসুখী মানুষেরই সমান দাবী আপনার উপরে এ-আমার অন্তরের কথা বলেই জানবেন।

অবশ্য এ কথা আপনাকে আমিই প্রথম বললাম এমন মনে করার মতো মূর্খ আমি নই।

খুবই জানতে ইচ্ছে করে, কত পুরুষ ও নারীর হৃদয় আপনি সহজেই জয় করে হেলায় ফেলে দিয়ে চলে গেছেন আপনার আপন-ভোলা পথে। "কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে। ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তবু যায় ঘুচে ॥ চকিত চোখের

অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল-- কোথা সে পথের শেষ কোন সুদূরের দেশ সবাই তোমায় তাই পুছে।"

ভাগ্যিস রবি ছিলেন ; তাই না ?

আমার নমস্কার, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি- বিনীতা নলিনীবালা রায়।

পুনশ্চ: পরের চিঠিতে ফিরে আসার সঠিক তারিখ ও সময় জানাবেন। এবং জানাবেন কী খাবেন সেদিন। কোন্ মাছ ? কেমন করে রান্না করব ; তাও আমার মতো নির্গুণ মহিলা কারো প্রতি আমাদের স্তুতি শুধু পছন্দসই রান্নার মধ্যে দিয়েই জানাতে পারি যে !

॥ ৪ ॥

গোলমালটা বাধালো বাটুমাই।

চিঠিটা যখন নলিনী ওকে ফেলতে দেন তখন একবার ভেবেওছিলেন যে, বলে দেন ওকে কেউই যেন না জানে। কিন্তু বলবেন বলবেন ভেবেও বলতে পারেননি। আত্মসম্মানে লেগেছিলো।

এখন বেশীর ভাগ মানুষই এই বালাইটিকে বিসর্জন দিয়ে নিশ্চিন্তে আছেন। কিন্তু যাঁরা পারেননি তাঁদের ঘন ঘন বিপদ ঘটেই। অনেক এবং অনেকইরকম কষ্ট তাঁদের।

বাটুমা ভেবেছিলো, কাজ-কর্ম সেরে দুপুরের দিকে গিয়ে ফেলে দেবে চিঠিটি। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিলো। একেবারেই নতুন ঘড়ি বলে তো বটেই ; তার উপর জীবনের প্রথম-হাতঘড়িটি পরার পর থেকেই বাটুমা বেচারীর সময় নিয়ে বড়ই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আগে বেশ বিকেলে বাগানের গাছেদের ছায়া, সকালে ছাগলওয়ালার ঘন্টা-বাজিয়ে চলে-যাওয়া ; পাশের বাড়ির সন্ধ্যারতির শাঁখের শব্দ, এই সবই ঘড়ির কাজ করত ওর কাছে। এক'দিনেই ও বুঝতে পারছে যে, হাতে ঘড়ি থাকলেই মনে হয় সময় বুঝি বড় তাড়াতাড়িই ফুরিয়ে যাচ্ছে ; ফুরিয়ে যাচ্ছে জীবনও। যদি ওর জীবনের এই সবে শুরু। তবুও, এই ফুরিয়ে-যাওয়ার ভয়টা কলকাতার মামা ওকে এইচ.এম.টি. হাতঘড়িটি কিনে না দিলে ওর বুকে এত অল্পবয়সে এমন করে সেঁধিয়ে যেতো না। ঘড়ি যে মানুষের সুখ-শান্তির কত বড় শত্রু তা ও বুঝতে শুরু করেছে।

মায়ের চিঠিটা দুপুরেও পারেনি ফেলতে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আজকে যে মশারী কাচার দিন ছিলো। মশারী যেদিন কাচতে হয় সেদিন বড়ই খাটনি পড়ে। গা হাত পায়ে ব্যথা ধরে যায়। সেদিন ভাত খাওয়ার ঠিক পরই ক্লান্তিতে চোখ একেবারেই জড়িয়ে আসে।

ঘুম যখন ভাঙলো বাটুমার তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। বাগানের পুব দিকে ছায়া জমছে। উঠেই মশারীগুলো ও তুলে ফেললো। নইলে বেলা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্তিকের হিমে ভিজে যাবে। মশারী তুলে রান্না ঘরে গিয়ে চা করলে। মাকে চা'টা দিয়েই ও চিঠি ফেলতে বেরুলো। গেট খুলে, পথে পড়ে জপ্পেস করে চার্মস সিগারেট ধরালো নাসিরুদ্দিন শাহর স্টাইলে।

চিঠি ফেলে ফিরে আসছে, মুদীর দোকান থেকে একটু সুজি কিনে নিয়ে ; ঠিক সেই সময়েই দেখে বৌদি মানে গিগি আসছে সাইকেল-রিক্সাতে চেপে।

অবাক হল বাটুমা। আজ ? এই সময়ে তো আসার কথা নয়।

গেছিলি কোথায় ? বাড়িতে নেই, আর আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছিস ?

গিগি শুধালো। ঝাঁঝালো স্বরে।

চিঠি ফেলতে।

বাটুমা বললো। ক্যাজুয়ালি। গিগির ঝাঁঝ হাঁসের গায়ে জল পড়ার মতো বাটুমার গা থেকে থেকেও পিছলে পড়ে যায়।

সতেরো বছরের বাটুমা অপরূপ সুন্দরী এই যুবতীর একজন মস্ত অ্যাডমায়ারার। কিন্তু গিগি যখন ঝাঁঝ দেখায় তখন থেকে ওকে ভারী বিচ্ছিরি লাগে। যারা সুন্দরী, তাদের কখনই রাগ করতে নেই বোধ হয়। রাগ, কুৎসিৎ করে তোলে বৌদির মুখখানিকে।

চিঠি ফেলতে এপই অসময়ে ? গিগি বললো কার চিঠি ?

মায়ের।

মায়ের চিঠি ? অবাক হয়ে বলল গিগি। তারপর বলল, মা আবার কাকে চিঠি লিখলেন ?

তা আমি কী করে বলব ? আমি কি ইংরিজি পড়তে পারি ?

বাটুমা এবারে ঝাঝোর সঙ্গে উত্তর দিলো।

একটু চুপ করে থেকে গিগির উৎসুক মুখে চেয়ে বললো, মনে হলো মামাবাবুকে। আন্দাজেই বলছি।

মামাবাবুকে ?

অবাক হওয়া গলায় শুধলো গিগি।

প্রাঞ্জল করে বললো, মানে আমার মামাবাবুকে ? কলকাতার মামাবাবু ?

হ্যাঁ। কাল যে মায়ের কাছে মামাবাবুর চিঠি এসেছিলো। সেই চিঠি পড়ার পরই তো মা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন।

সে কী ! তাইই ? তা, চিঠিতে কি লিখেছিলেন মামাবাবু ?

আররে। তা আমি কী করে বলব ?

গিগি লজ্জা পেয়ে গেলো। বুঝলো, এই প্রশ্ন বাটুমাকে করাটাই অনুচিত হয়েছে ওর।

আপনি আজ এতো তাড়াতাড়ি এলেন যে বৌদি ?

শ্লথগতি সাইকেল-রিক্সার পাশে পাশে দ্রুত চলতে চলতে বাটুমা জিজ্ঞেস করলো।

আজ আমাদের স্কুলের একজন দিদিমণি মারা গেলেন।

সে কি ? হঠাৎ ?

হ্যাঁ। একেবারেই হঠাৎ।

কোথায় মারা গেলেন ? জব্বলপুরেই ? না অন্য কোথাও ?

জব্বলপুরে, মানে কি রে ? এক্কেবারে স্কুলের ভিতরেই। কাজ করতে করতে। তাইই তো স্কুল ছুটি হয়ে গেলো।

বুড়ো হয়েছিলেন খুবই ? সেই দিদিমণি ?

বুড়ো ? নাঃ। এই আমার মতো বয়স হবে।

অন্যমনস্ক গলায় বললো, গিগি।

তারপরই বললো, ওঃ। তুই তো চিনিসও তাকে। ভালো করেই চিনিস। আমাদের বাড়ি কত্ব এসেছেন। ঝুনু দিদিমণিরে !

সে কী ? বিশ্বাসই তো করতেস পারছি না আমি। এত তাড়াতাড়ি কেউ মরে নাকি ? ঝুনু দিদিমণি !

হতভম্ব গলায় বলল বাটুমা সত্যিই দুঃখিত হয়ে।

মরার কোনো সময় নেই।

অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ও। ঝুনুর এই আকস্মিক মৃত্যু বন্ধু-হারানো শোক বটেই তা ছাড়াও আরো অন্য কিছু জটিলতাও বয়ে আনবে তা গিগির জীবনে। কপালে দুপাশেরই শিরা দপ্‌দপ্‌ করছিলো গিগির।

বাটুমা ওর নতুন হাতঘড়িটার দিকে তাকালো একবার। বাঁ-হাতটি উপরে তুলে একেবারে প্রায় দু'চোখ কাছে নিয়ে এসে।

হাত ঘড়িটি পড়ার পর থেকে ও প্রায় প্রতি মিনিটেই ঘড়ি দেখে। ঘড়িটিকে নিজের জামার কোণ দিয়ে মোছেও। শোবার সময়, প্রতি রাতে বালিশের তলায় নিয়ে শোয়। "মরার কোনোই টাইম নেই।" গিগির এই কথাটা ভালো লাগলো না ওর মোটেই। ঘড়ি কি মানুষের মরার সময়ও ঠিক করে দেয় ? ঘড়ি জিনিসটাকে যত ভালো ভেবেছিলো, তত ভালো মোটেই নয়।

ভাবলো বাটুমা।

রিক্সা চলছিলো ক্যাঁচোর-কোঁচর করে আস্তে আস্তে। ভাবতে ভাবতে চলেছিলো গিগি বাটুমা যে তার পাশেই আছে সে কথা মনেই ছিলো না আর। ভাবছিলো ঝুনুর কথা।

ওরা দুজনে একই দিনে স্কুলে ঢুকেছিলো। মানে, টিচার হয়ে। ঝুনু, জব্বলপুরেরই মেয়ে। ছেলেবেলায়ই ওঁর বাবা মারা যান। ওই-ই বড়। ছোট ভাইটিকে নিজেই টিউশনী করে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা শেখায়। সে এখন চাকরী পেয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি সংস্থায়। ভালোই চাকরী। মাণ্ডু, না পাচমারী, না খাজুরাহো কোথায় যেন আছে এখন। বলেছিলো ঝুনু, কিন্তু ভুলে গেছে গিগি।

টাকা-পয়সা, সেই ভাই ঝুনুকে পাঠায়নি কোনোদিনও কিছুই। ঝুনু চায়ওনি কখনও। বড়ই টনটনে আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল ওর। গিগি ভেবে দেখেছে যে, আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা ভালো। কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের আত্মসম্মান জ্ঞান, পাশে বেঁধে-রাখা গাধাবোটেরই মতো জীবনের গতিটা বড়ই শ্লথ করে দেয়। পদে পদে থেমে দাঁড়াতে হয় সেইসব মানুষদের। ঝুনুর মা যতদিন ছিলেন, ততদিন অবশ্য ওকে বেশ অসুবিধের মধ্যেই ছোট্ট সংসারটি চালিয়ে নিতে হতো। তখন কিছু টাকা বেশি পেলে, মাকে হয়তো আরও একটু ভালো করে রাখতে পারতো। ঝুনুর মা মারা গেছিলেন গত বছরে। তারপর থেকে একজন মানুষের খাওয়া-পরার খরচ, ওষুধ-পত্র, ডাক্তার ইত্যাদির খরচও কমেছিলো। খুব একটা ভালো না হলেও মোটামুটি সচ্ছলভাবে।

"সম্মানটা সুখের চেয়ে অনেকই দামী।" একথা ঝুনু প্রায়ই বলতো। কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে, খারাপ লাগলো গিগির। খারাপ লাগার কারণও ছিলো। মনে একটা কাঁটা বিঁধছে বারবার।

ওদের স্কুলের পাশেই একটি মস্ত মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীর অফিস আছে। একসময় বিদেশেই ছিলো, এখন "ফেরা" আইনে দিশী। তবে দিশী শুধু নামেই। বড় সাহেবরা এখনও যদিও দিশী কিন্তু সেই বিদেশি ঠাট-বাট এখনও পুরোপুরিই রয়ে গেছে। ড্রাইভার পিওনদের উর্দি থেকে আরম্ভ করে কর্মচারীদের গাঁক-গাঁক করে ইংরেজী বলা পর্যন্ত। লুটে-পুটে খাচ্ছে টপ-ম্যানেজমেন্টের লোকেরা।

সেই কোম্পানীরই একজন অল্পবয়সী অফিসার চিকি শ্রীবাস্তব। নামটা "চিকি" হলে কি হয় এবেবারেই চিকি নয় সে। বাঙলা গান, বাঙলা সাহিত্য, বাঙালী মেয়ে বলতে সে পাগল। ভারী ভদ্র, সভ্য। চিকি হরিয়ানার এক নামী পরিবারের ছেলে। দারুণ ফিগার। ভালো ক্রিকেট খেলে এখনও।

ঝুনুকে স্কুলে আসছে-যেতে দেখতে পেতো চিকি ওর এয়ারকন্ডিশানড ঘরের জানালা দিয়ে। ঝুনুও লাজুক চোখ তুলে দেখতো ওকে কী করে যে শুধুমাত্র দেখেই প্রেম হয়ে গেছিলো দুজন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে, কে জানে? আজকালকার দিনে এমনটি ভাবা পর্যন্ত যায় না।

ঝুনু প্রায়ই গিগি বলতো যে, চিকি ওকে বলেছে, ঝুনুর মুখের আশ্চর্য বিধুর বিষণ্ণতাই নাকি চিকিকে মুগ্ধ করেছিলো। বিষণ্ণতা, নাকি গিগির মুখে প্রসাধনের মতো লেগে থেকে, সে মুখকে উজ্জ্বলতাকে দিতো। চিকির নাকি কেবলই মনে হতো যে, এই শান্ত, শালীন বাঙালী মেয়েটির সব বিষণ্ণতাকে আলো করে তুলে তাতে খুশির রংমশাল জ্বেলে দেওয়ার জন্যই যেন চিকি এই পৃথিবীতে এসেছিলো? গিগি! একেই বলে পেরেম! হাইট অফ ইন্নোসেন্স। ফুলেরই মতো পবিত্র প্রেম।

ঝুনু হেসে বলতো, বিষণ্ন মানুষকে; বিষণ্নতাকে কেউই পছন্দ করে না বলেই তো জানতাম। আর দ্যাখ আমার বেলায় বিষণ্নতাই সব প্রসন্নতার কারণ হয়ে এলো। কখন যে কী ঘটে কার জীবনে তো কেউই বলতে পারে না, বল গিগি?

গিগি চুপ করেই থাকতো। কথা বলতো না উত্তরে।

বাংলা পড়তো ঝুনু। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং নানান আধুনিক বাঙালী কবিদের কবিতাও আবৃত্তি করতো ও সুন্দর সুললিত গলায়। গিগি, বাংলা ভালো করে পড়েনি বলে সেইসব মুহূর্তে ওর মন খারাপ লাগতো; অন্তত যতক্ষণ ও ঝুনুর সঙ্গে থাকতো।

চিকি শ্রীবাস্তবের মতো ছেলে সত্যিই হয় না আজকাল। ওর মা-বাবা এসে গত মাসে ছেলের সঙ্গে পনেরো দিন থেকে ঝুনুকে দেখে তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করে বিয়েতে মত দিয়ে গেছিলেন। গিগিরা ওঁদের নেমন্তর করে খাইয়েও ছিলো একদিন। বিয়ে হবে ঠিক হয়ে ছিলো গরমের সময়ে। তারিখও ঠিক হয়ে গেছিলো।

চিকির ফ্ল্যাটটা দারুণ। মারুতি কিনেছে, সাদা-রঙা। পার্সোনেল। এ.সি. বসানো। অবশ্য অফিসের শোফার-ড্রিভন অ্যাম্বাসাডরও আছে। নতুন ফ্রিজ, রুম-এয়ারকণ্ডিশনার। বছরে একমাস ছুটি। লিভ ট্র্যাভেলস এবং পয়সা। এসিতে অথবা প্লেনে। তিন বছরে একবার বিদেশে।

নট ব্যাড।

ঝুনু হেসে বলতো।

যা যা থাকলে আজকাল একজন তিরিশ বছরের যুবককে "ভেরী এলিজিবল ব্যাচেলর" বলা চলে, চিকির তার সবই ছিলো।

বিয়ের আগেই একদিনের জন্য ঝুনুকে আদর করতে চেয়েছিলো চিকি। ঝুনুই নাকি বাধা দিয়েছিলো। বলেছিলো, ক'তো মাস। তোমার মা-বাবার কাছে, আমার বিবেকের কাছে, আমি খুবই খাটো হয়ে যাবো। যা তোমারই, তা পাবার জন্য অমন অধৈর্য্য হওয়া অন্তত তোমার মতো মানুষকে মানায় না। তীব্রভাবে যা-কিছুই চাওয়া যায় তা পাওয়ার আনন্দর চেয়েও সেই পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষার মধ্যে যে গভীর সংযম তার আনন্দ অনেকেই বেশি। তুমি নিজেও জানো যে বেশি। তবে ?

এসব কথা গিগি অবশ্য ঝুনুর কাছেই শুনেছে।

আরও অনেক কথাই বলতো ঝুনু। গিগি তার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলো। কিন্তু .....

মেয়েদের বাংলার ক্লাস নিতে নিতে বাঁদিকের বুকে হাত দিয়ে চেয়ার থেকে হঠাৎই পড়ে গেলো ও বারোটার সময়ে। মাত্র একত্রিশ বছর বয়স। ছিপছিপে সুন্দর ফিগার।

ভাবাই যায় না।

ক্লাসের মেয়েরা ভয়ে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিলো। দু'জন মেয়ে দৌড়ে এসে প্রিন্সিপাল মিসেস জয়কারকে খবর দেয়। গিগি খবর পেয়েই দৌড়ে গিয়ে খবর দেয় পাশের অফিসে, চিকিকে। চিকি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ডঃ জয়সোয়ালের নার্সিং হোমে যায়। ডাক্তার নাড়ি দেখে, স্টেথসকোপ লাগিয়ে, মাথা নেড়ে ঝুনুর হাতটি ছেড়ে দেন। মুখে বলেন, সরি। বলেই, ঝুনুর বিষণ্ন সুন্দর কিন্তু ক্লান্ত মুখে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই, মুখ ঘুরিয়ে নেন।

কী দেখলেন ডাক্তার ঝুনুর মুখে ? বঞ্চনার ছাপ কি ? ঝুনু কি কোনোরকমে জানতে পেরেছিলো ?

মিসেস জয়াকারও বলেছিলেন, গাড়িতে নাকি একবার জ্ঞান ফিরেছিলো ঝুনুর হাতটি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকি আর্তনাদ করে উঠবে। ভেবেছিলো, কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে।

কিন্তু শুনলো যে, কিছুই নাকি করেনি সে তখন মনে হয়েছিলো সকলেরই যে, ও হঠাৎ-শোকে পাথর হয়ে গেছে। আসলে, পরে ভেবে দেখেছিলো যে, ওদের মতে এই আধুনিক ছেলে-মেয়েরা, আর্তনাদ করে না। ওরা নিজেদের আবেগ লুকোনোকেই সভ্যতা বলে জানে বলেই নয় শুধু ; আসলে বড় বক্রও হয়ে গেছে বলে। আর্তনাদ সুদ্ধ সারল্যেরই এক অভিব্যক্তি। ওরা আর কখনও সেই নন্দনবনে ফিরতে পারবে না।

ঝুনুকে নার্সিং-হোমের মরচুয়ারিতে নিয়ে এসে চিকিই ঝুনুর কাকা এবং ওর ছোট ভাইকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেয়। টেলেক্স বা ফোন নাম্বার কারো কাছেই ছিলো না।

চিকিই গিগিকে নামিয়ে গেল এক্ষুনি পাচপেডির মোড় পর্যন্ত। মা-বাবাকে ট্রাঙ্ক-কল এক্ষুনি করা দরকার। ওদের বিয়ের কার্ড ছাপানোর কথা আছে দু-একদিনের মধ্যেই। এতদিনে ছাপা হয়তো হয়েও গেছে।

মস্ত মেহগিনি গাছের লুটিয়ে-পড়া ছায়ায় নির্জন পথের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গিগিকে নামাবার আগে, চিকি গিগির বুকে মুখ বলেছিলো, গিগি ! তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেউই রইলো না।

চিকির চোখে জল ছিলো না, জ্বালা ছিলো। শোর আর অনুতাপ মাখামাখি হয়ে ছিলো সেই জ্বালাতে।

গিগির নিজেরও খুবই অপরাধী লাগছিলো। যদি জানতো আগে যে ঝুনু এমন হঠাৎ মরে যাবে তাহলে .....

চিকির সঙ্গে গিগিই কিন্তু ঝুনুর প্রথমে আলাপ করিয়ে দেয়। ওদেরই বাড়ির এক পার্টিতে। যদিও চিকির অফিস-ঘরের জানালা দিয়ে দু'জনেই দু'জনেকে অনেকবারই দেখেছিলো আগেই।

ভৃগুর ব্যাঙ্কেই চিকিদের কোম্পানীর অ্যাকাউন্ট। সেই সূত্রে চিকির সঙ্গে আলাপ ছিলো ভৃগু-গিগির অনেকেই আগে থেকে। ঝুনুকে যেমন ভালো লেগে যায় চিকির ; গিগিকেও তেমনিই লেগে যায় অনেকেই আগে। গিগিকে ভালোলাগে তার সাহসের, অ্যাডভেঞ্চারাস আধুনিক স্বভাবের কারণে, আর ঝুনুকে তার ভীরুতা এবং প্রাচীন-পন্থার জন্যে। তাছাড়া গিগি অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী, তাকে ভালো লাগার মধ্যে এক ধরনের চৌর্যবৃত্তি ছিলো, ছিলো গোপনীতা ; মিথ্যাচারও ভৃগুর সঙ্গে। চিকির আর গিগির মতো অনেকেই আধুনিক ছেলে-মেয়ে আছে

আজকাল, যাদের ভালোবাসাটা টুকরো-করা-ভালো বাসা। অনেকই বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে মানুষের জীবনে, সম্পর্ক : চাওয়া-পাওয়ার রকম, মূল্যবোধ, সব কিছুই। বিবেক এবং চরিত্রের সংজ্ঞাও। বড় অধৈর্য্য, অসংযমী হয়ে পড়েছে ওরা অনবধানেই।

চিকির সঙ্গে ঝুনুর শারিরীক সম্পর্ক হয়নি কখনওই। কিন্তু আশ্চর্য। গিগিই একদিন শুয়েছিলো চিকির সঙ্গে। চিকিরই ফ্ল্যাটে। অথচ চিকি এবং গিগি দু'জনেই ঝুনুকে খুবই ভালোবাসতো। চিকিও সত্যি সত্যিই পছন্দ করে ভৃগুকে। গিগিও ভালোবাসে তার স্বামীকে। তাদের একমাত্র সন্তান টুটুকেও। তবুও, চিকির সঙ্গে শুয়ে গিগি দারুন শারীরিক এবং মানসিক সুখ পেয়েছিলো। চিকি বলেছিলো যে, ও ও তাই-ই পেয়েছে। অথচ গিগি, ঝুনু বা ভৃগুর প্রতি যে একটুও অন্যায় করেছে একথা তার একবারও মনে হয়নি।

একজন মানুষের জীবনের অনেকগুলো দিকে থাকে। অন্য কোনো মানুষকেই, যারা জীবন ঘিরে আছে, তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত না করে যদি নিজেকে আরও বেশি সুখী করা সম্ভব হয়, তাহলে কেন তা তার সবকিছুই দেয় তাকে। সব সময়ই দেবে। ভৃগুই বরং বিয়ের পর থেকে একদিনও শারীরিকভাবে সুখী করতে পারেনি গিগিকে। সত্যি। একদিনের জন্যেও না। ওদের সেক্সুয়াল-ইনকমপ্যাটিবিলিটি ছিলো। অ্যামিরিকা হলে বিয়েই হতো না। বিয়ের আগে পরীক্ষা করে বা শুয়ে দেখতো। হয়তো এ দেশের ঘরে ঘরে লক্ষ লক্ষ বিবাহিতা মেয়ে এবং ছেলে আছে যাদের অনেকেরই হয়তো চিকির মতো বা গিগির মতো কারো সঙ্গে শুয়ে স্ত্রীর বা স্বামীর অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে নেবার সাহস বা "কুরুচি" থাকে না। কারো বা সুযোগই হয় না। তাছাড়া, এদেশের বেশির ভাগ মেয়েদের কাছে নিরাপত্তা, সতীত্ব, ঘর, সন্তানই তো সব। শরীরের সুখ নিয়ে অত বাড়াবাড়ি করার সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সময় যেমন নেই, তেমনি প্রবণতাও নেই বেশির ভাগেরই। একটু ভ্রষ্টতা ছাড়া পরিপূর্ণ সৈখ এই বাঘবন্দীর ঘরে থেকে পাওয়া যে যায় না সে কথা গিগি ভালে করেই জানে জেনেছে। তাই-ই ও নিরুপায়। তবে, ওর কোনোই অপরাধবোধ নেই। যে-সব মেয়েরা তাদের কপালে যে-জীবনই জুটুক না কেন সেই জীবনটাকে ভগবানের লটারী বলেই মেনে নিয়ে দৈনন্দিনতার অভ্যেসের কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে যায় তাদের মতো হতে পারবে না গিগি। চোখ-বন্ধ করে থেকে, ভালো কথা শুনবো না, সুন্দর বা কাম্য পরুষের কাছে যাবো না, নিজেকে সবদিক দিয়েই বঞ্চিত করে রাখার ব্রত নিয়েই এই একটি মাত্র জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে, তারা। ঘর-সংসার, শাশুড়ী-ননদ, ছোঁয়া-ছুঁয়ি, বিয়ে-শ্রাদ্ধ-জন্মদিন-বিয়ের তারিখে মৃত্যুদিন, আঁচার-কাসুন্দি, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদিই তাদের কাছে জীবনের সমার্থক। জীবনের মানে না বুঝেই নতুন ঘড়ি হাতে পড়া বাটুমার মতো ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চেয়েই জীবন শেষ করে দিচ্ছে সেই বেচারীরা। জীবন যে ঘড়ির জন্যে নয়, জীবনের জন্যই যে ঘড়ি ; এ-কথাটাই-বা বোঝে বা উপলব্ধি করে ক'জন ? জানলেও সেই জানা-নির্ভর জীবনকে পাওয়ার সাহসই বা আছে ক'জনের ?

কিন্তু নিজেকে আজ গিগির যতখানি লাগছে ঝুনুর মৃত্যুতে, তেমন আবার আশ্চর্যও লাগছে একটু। ওর আর ঝুনুর চরিত্রে অনেকই তফাৎ ছিলো। ঝুনু তার ভাবী স্বামীর বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও শুতে আদৌ রাজী হয়নি চিকির সঙ্গে। অনেক আধুনিকা মেয়েদের মধ্যেও "সতীত্ব" সম্বন্ধে নানারকম প্রাগৈতিহাসিক শুচিবাই এখনও রয়ে গেছে। তবুও বিয়ের পরে শরীর এবং জীবনকে অন্যভাবে দেখে সব মেয়েই। যা, একদিন "মরে গেলেও" কাউকেই দেওয়ার কথা ভাবা পর্যন্ত যেতো না, তাই-ই বিবাহিত জীবনের অভ্যেসে জর্জরিত হয়ে দিয়ে দিতে দু'বার চোখের পলকও পড়ে না। জীবনই মানুষকে বদলে দেয়, যেমন তা দৌড় করিয়েও নিয়ে যায় মানুষকে ট্রেনিং-দেওয়া অ্যালসেসিয়ান কুকুরকে যেমন করে দৌড় করায় পুলিশের ডগস্কোয়াডের ট্রেনার। জীবনই, জীবিতর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ঘড়ি কখনওই নয়। এসব কথা গিগি জীবন থেকেই শিখেছে।

রিক্সা মোড় নিল। আশ্চর্য ! কত অল্প পথ রিক্সায় বসে আসতে আসতে কত দূরের পথই না ঘরে এলো মনে মনে ! ভেবেও অবাক লাগলো গিগির। মানুষের ভাবনা মতো দ্রুতগতির আর কিছুই নয়।

ঝুনুর সঙ্গে চিকির বিয়ে হলে, স্বপ্ন-দেখা, সতীত্ব সম্বন্ধে অতি সাবধানী, কবিতা আওড়ানো ঐ ঝুনু যে-চিকিকে পেত ; সে তো এটো চিকিই ! এবং ঝুনুর সঙ্গে বিয়ের পরের চিকি আবারও হয়তো গিগির দিকে ঝুকতোও। গিগি এই সত্য আবিস্কার করেছে শিহর-তোলা এক সুখে যে,

ওর শরীরে কোনো বিশেষ যাদু আছে যে-কোনো পুরুষকেই ক্রীতদাস করে রাখার ক্ষমতা ও রাখে। একবার যে-পুরুষ ওর স্বাদু শরীরের স্বাদ পেয়েছে, সে চুরি-করে মাছ-খাওয়া বেড়ালের মতো নির্লজ্জ, দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। একবারের পরই বার বার চায় পৌনঃপুনিকতা। কিন্তু এ কথা গিগি জানতো বলেই ঝুনুকে ঐ প্রবঞ্চনা করতে গিগির বিবেকে লেগেছিলো। মানুষের বিবেক তো আরশোলারই মতো। মরেও মনে না তা। এইসব মিশ্র, জটিল কারণে গিগি আজ ঝুনুর আকস্মিক মৃত্যুতে ভীষণ দুঃখী। অনুতপ্তও। ঝুনু এমন করে হঠাৎ চলে গেলো বলেই, তাকে ঠকানোর অপরাধটা বেশী বাজছে যেন। আবার সুখীও লাগছে দারুণ ঝুনু এমন করে ওকে নিষ্ফটক করে চলে গেলো বলে। গিগিকে ছোট হতে হলো না ; প্রবঞ্চক হতে হলো না জীবিত বান্ধবীর কাছে।

ঝুনু বেঁচে থাকলে চিকির সঙ্গে বিয়ে তো ওর হতোই এবং তাহলে, ঝুনুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে হতো। বিবাহিতা, প্রাচীনপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করতে যে হলো না, এ কথা ভেবে হালকা বোধ করছিলো ও নিজেকে।

নিজেকে একেবারেই ভালো বোঝে না গিগি। কোনো আধুনিক পুরুষ অথবা নারীই কি বোঝে নিজেকে ? এই সময়টা, এই দেশে, হয়তো এই পৃথিবীতেও ; বড়ই গোলমালের সময়, ভাঙচুরের সময়। কোনো মানুষকেই অন্যে পুরো বোঝে না যেমন যে নিজেও বোঝে না নিজেকে।

বাড়ি পৌঁছে গেছে যে গিগি কখন তা খেয়ালই ছিলো না। বাগানের মুখের গেট খুলে বাটুমার ভিতরে ঢোকার শব্দেই হুঁশ হলো। ভাবনার জগতেই ছিলো এতক্ষণ ও।

রিক্সাওয়ালা চেনে গিগিকে। নামার পরও যখন ভাড়া দিল না গিগি, লজ্জায় কিছু বলতে পারলো না রিক্সাওয়ালা। যারই লজ্জা আছে, সেই ঠকে। চেনের কিররর্‌র্‌ শব্দ তুলে সে যখন ফিরে যাচ্ছে তখনই খেয়াল হলো গিগির। ওকে ধমক দিলো পয়সা না নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারপর কাছে ডেকে পয়সা দিলো।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে মা'কে দেখতে পেলো না।

মা যেন কীরকম হয়ে যাচ্ছেন ! মেজ'মামার সঙ্গে আবার চিঠি-চাপাটি চালানো কেন ? ভীমরতি ধরে কি মানুষের বয়স হলে ? সত্যিই ? সেনিলিটি সত্যি বড়ই খারাপ জিনিষ। গিগি, তাই সেনাইল হওয়ার আগেই মরে যেতে চায়।

মা বোধ হয় বাগানে। পরে কথা বলবে। টুটুকেও দেখতে না কোথাওই।

জিগগেস করতে বটুমা বললো, শ্রাবণীদের বাড়ি গেছে।

মা আজকাল টুটুকেও দেখেন না মোটেই ভালো করে। ছেলেটা বস্তীর ছেলেদের মতো বিচ্ছিরি পোশাকে এ বাড়ি -ও বাড়িতে গিয়ে সময় কাটায়। গিগি প্রায়ই শোনে যে, শ্রাবণীদের বাড়ি গেছে। কেন? শ্রাবণীদের বাড়িতেই যদি মা সব সময়ই টুটুকে ফেলেই রাখবেন, ছেলেটাকে যত্ন করে নাই-ই একটু রাখবেন ; তবে শাশুড়িকে ওরাই বা দেখতে পাবে কেন ? এখন সব সম্পর্কই তো গিভ এন্ড টেক -এর হয়ে গেছে। দাও কিছু, দিয়ে বদলে কিছু নাও। ভূণ্ডকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন শুধুমাত্র সেই সুবাদেই তো আরা সারা জীবন ছেলে-বৌ তার মায়ের বোঝা বইবে না।

মায়ের সঙ্গে একটু ফ্যাঙ্কলী কথা বলতে হবে। ঐ শ্রাবণীদের বাড়ির পরিবেশটা আদৌ ভালো লাগে না গিগির। ওদের সবই আছে, অথচ কী যেন নেই। পাতি-পাতি গন্ধ বেরোয় ওদের বাড়ির সকলেরই গা থেকে।

শ্রাবণীর রিটায়ার্ড বাবার নলিনীর প্রতি যে একটি সফট-কর্ণার আছে তা না বোঝার মত বোকা গিগি নয়। কিন্তু কলকাতার মেজমামা হঠাৎ এসে পড়ে কী কাণ্ডই যে ঘটিয়ে দিলেন তার ইমপ্যাক্টটা পর্যন্ত গিগি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মায়ের উপরে। বিধবা, আচারনিষ্ঠা, প্রাচীন-পন্থী, নলিনীর মধ্যের মাটিও যে এখনও এত নরম, এত উর্বরা ; শীতের বর্ষণেও যে রুক্ষ মাটিতে এমন করে ফুল ফুটতে পারে, এ কথা ভেবে অবাক হচ্ছে।

বাথরুমে ঢুকে, গীজারের গরম জালের ট্যাপ খুলে ঠাণ্ডা জলের ট্যাপেরও মুখ ঘুরিয়ে কুসুম গরম জলের হাওয়ার খুলে ভালো করে চান করতে লাগলো গিগি। বিকেলে ও কোনোদিনই চুল ভিজোয় না। আজ ভিজোলো। ওর চুলে আজ মৃত্যুর গন্ধ লেগেছে। গা ঘিনঘিন করছিলো।

একটু পরেই ভৃগু আসবে অফিস থেকে এলে, আবারও যাবে ওরা ঝুনুদের বাড়ি। স্কুলের টিচাররা, ঝুনুর সব সহকর্মীরা, চিকি, চিকির দু-একজন সহকর্মীও আসবে। ওরা যখন ঝুনুর বাড়ি ভরে বসে থাকবে তখন ঝুনু শুয়ে থাকবে, একা। হাসপাতালের ঠাণ্ডা ঘরে, তার হৃদয়হীন ছোটো আছে ভাই কবে এসে মুখাগ্নি করবে নেই অপেক্ষাতে।

ঝুনুর বুড়ি আয়া অবশ্য ঝুনুর বাড়িতে। মুঙ্গলী ! ও কাঁদছে সবচেয়েই বেশি। ছেলেবেলা থেকে ওইতো ঝুনুকে বড় করেছে। ঝুনুর সুখ-দুঃখের সবচেয়ে বড় দাবীদার ছিলো ওই। মুঙ্গলী এক মেয়ে। ওর স্বামীর সঙ্গে ভেড়াঘাটে থাকে, মুঙ্গলীর স্বামী ভেড়াঘাটের নর্মদাতে নৌকা চালায়। নর্মদা নদী সেখানে গভীর খাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। বিয়ের পরে ভৃগু নিয়ে গেছিলো একবার। দু'পাশে মার্বেল পাথরের খাড়া পাহাড়। দিনে ও রাতে তাদের রঙ আলাদা আলাদা। স্বপ্নরাজ্য বলেই মনে হয়। সেখানে মার্বেলের কোটরে বসে-থাকে বুড়ো-বাজ। আর পাথরের খাঁজের মধ্যে লেজ-ছড়ানো কালো কুৎসিৎ, রোদ পোয়ানো বুড়ো মেছো কুমীর। সেখানে মুঙ্গলীর বর দুখিয়াও ঘুমন্ত মেছো কুমীরেরই মতো গাঁজায় দম দিয়ে পড়ে থাকে। চিকিবাবুর সঙ্গে ঝুনুদিদির মিয়ে হলে। মেয়ে রসিয়াটাকে নিয়ে আসতো মুঙ্গলী চিকির বাংলোতে। ঐ কমপ্লেক্সে ভালো মায়না পাওয়া অনেক ছোকরা ড্রাইভার আছে। একটা ভালো বিয়েও দিতো পারতো হয়তো। চিকি-সাহেব খাস-বেয়ারার সঙ্গেই অবশ্য মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো মুঙ্গলী। মুঙ্গলীর নিজের জীবনে দুটি পেটের ভাত জোটানো ছাড়া অন্য কোনো সুখেরই চিন্তার সময় হলো না। মেয়েকে যদি সুখ দিতে পারতো কিছু, তাহলে মা ও মেয়ে থাকতে পারতো একই সঙ্গে। নাতি-নাতনী হলে রোদে বাসে বসে তাকে দু'পায়ের মধ্যে শুইয়ে তেল মাখাতো। হলো না। এ জীবনের অনেকই স্বপ্নের মতো এই স্বপ্নও সত্যি হলো না মুঙ্গলীর !

গিগি ভাবছিল শাশুড়ির যা মতি-গতি দেখছে তাতে তেমন বুঝলে মুঙ্গলীকেই রেখে দেবে।

চান করতে-করতে ওর চুল-ছড়ানো সিক্ত ফেনময় নগ্নতার দিকে শাওয়ারের জলের মধ্যে দিয়ে আলো-জ্বলা বাথরুমের নিজেকে দেখছিলো গিগি। এই সময় নিজেকে দেখতে ওর খুব ভালো লাগে।

বাথরুমের দরজাতে একটা ফুটো করেছে বাটুমা। গিগি জানে। বাটুমারও ভালো লাগে নিশ্চয়ই দেখতে। লুকিয়ে বাটুমা ওর চান দেখে। শুধু দেখেই শিহরিত হওয়ার একটা বয়স সকলেরই থাকে। দেখে, দেখুক। এই-ই বাটুমার পারকুইজিট। এই জন্যেই হয়তো চাকুরি ছাড়ে না ও। জীবন ও যৌবনের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে, তাদের পছন্দ করে গিগি।

তবে শরীরটা, সেই কলেজের দিনের মতো, বিয়ের আগেকার মতো আর নেই। তাছাড়া তখন জীবন সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলও ছিল ; প্রত্যাশা ছিলো নানারকম। সেই সব অনভিজ্ঞ দিনে, আয়নাতে প্রতিফলিত নগ্ন-শরীরের মধ্যে থেকে অনেক প্রত্যাশা ঝিলিক দিয়ে উঠতো। আজ সে সবই নিভে গেছে। আসলে ধারা-স্নান আর জীবন তখনই পুরোপুরি সমার্থক ছিলো। আর আজকের জীবন, অবগাহনের জীবন সর্বাঙ্গন এখন গভীর জলের তলায় ; শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নতার চাপ। সমস্ত মনেও তাই-ই। এই সুগভীর বিভিন্নমুখী স্রোতের জলে, যে জলকন্যা সাঁতার জানে, শুধু সেই-ই জলকেলি করে বেড়াতে পারে। আর যে জানে না ; সে হাবুডুবু খায়। তারপর ডুবে মরে।

গিগি বোকা নয়। সেই সাঁতার-না-জানা মেয়েদের মতো। ভবিষ্যৎ-টবিষ্যতে বিশ্বাসই করে না ও। ও একেবারেই বর্তমানেরই জীবন। পরী হতে চায় না, জলকন্যাও নয়। পোকা-মাকড় সাধারণ মাছ হলেও ও শুধু বর্তমানেরই। জীবন্ত। সাঁতরে চলেছে তাই-ই। বোকা-বোকা ইডিয়াটিকে রোমান্টিসিজম ওর কোনো দিনও ছিলো না।

হঠাৎই লোডশেডিং হয়ে গেলো।

হঠাৎই যেন আয়নায় একটি কোমরসমান চুল ছড়ানো, অন্ধকারতার অন্য কোনো মূর্তি ছায়া ফুটে উঠলো বাথরুমের ভিজে অন্ধকারে।

ঝুনু ! হ্যাঁ ঝুনুই। চুল-খোলা সম্পূর্ণ নগ্ন। ঝুনুর দুটি হাত এগিয়ে আসছে সাঁড়াশির মতো গিগির গলার দিকে। মুখে এক আশ্চর্য হাসি। যেন বললো : গিগি ! তুই ! আমার বন্ধু ? এই বন্ধু ! ঐপারে গিয়ে আমি এখন সব জেনে গেছি। তুই ? চিকির সঙ্গে তুই ? আঃ আর ..... ভাগ্যিস মরে গেলাম। বেঁচে গেছি রে ! বড়ই বেঁচে গেছি তোদের হাত থেকে : আমি আধুনিকা

মেয়ে নই । হতে চাইওনি কোনোদিন । আমার বিষাক্ত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পড়বে তোর আর চিকির ঘাড়ে, কানের পাশে, এমন সব মুহূর্তে ..... যখন তোরা একা থাকবি, অথবা দোকা । তোরা যখন ..... । দেখিস একদিন আমি না, ঠিক .....।

হাত দুটো যেন আরো এগিয়ে আসতে লাগলো গিগির গলার দিকে । ধরলো, ধরলো : চেপে ধরলো বলে সাঁড়াশির মতো ।

ভয়ে, গলা শুকিয়ে গেলো গিগির । জরায়ু গুটিয়ে আসতে লাগলো দম-দেওয়া স্প্রিং-এর মতো । চিৎকার করে উঠতে যাবে ভয়ে, ঠিক সেই সময়ই দপ করে আলো আবার জ্বলে উঠলো ।

আঃ । ওর স্নিগ্ধ সুন্দর সুডৌল আলোকিত শরীরের দিকে আবারও ভালোবাসায় তাকালো গিগি । দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে গেলো । দুঃখ হলো খুবই ওর ঝুনুর জন্যে । জীবনের একটা মস্ত আনন্দের স্বাদ না পেয়েই এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে ওর বিষণ্ন মুখ নিয়ে চলে গেলো বেচারী । বিয়ের দিনের জন্যে হাঁ করে বসে থাকার মতো মান্ধাতার আমলের ইডিয়েটিক ধারণার জন্যই এমন হলো ।

মনে মনে বললো গিগি চুল মুছতে মুছতে ।

দরজার ফুটোটাতে মুখ নামিয়ে দেখতে যেতেই বাটুমার চোখ দুটো সাপের জিভের মতো সরে গেলো ।

বুঝলো গিগি । দেখছিলো বাটুমা ।

চান করে বেরোতে বেরোতেই ভৃগু এলো । খবরও আগেই পেয়েছিলো । স্কুল থেকেই ফোন করে দিয়েছিলো ওকে গিগি । তখনও স্তব্ধ হয়েছিলো ভৃগু ।

মানুষটা সোজা । শোক, ওকে বিধ্বস্ত করে যেমন করে, অশিক্ষিতদের ।

গিগি ভাবলো ।

তাড়াতাড়ি ভৃগু চান সেড়ে নিলো । জল-খাবারের টেবলেও নলিনীকে দেখা গেলো না । ভৃগুর প্রশ্নর উত্তরে বাটুমা বললো, মা একটু হাঁটতে গেছেন ।

হাঁটতে গেছেন ?

কিছুটা অবাক এবং কিছুটা অন্যমনস্ক গলায় বললো ভৃগু ।

হ্যাঁ ।

বাটুমা বললো ।

কোথায় ?

আজ ঝুনুর ভাবনাই ভৃগুকে আচ্ছন্ন করে ছিলো । আবারও অন্যমনস্কর মতোই বললো, কোথায় ?

বললেন তো সাউথ সিভিল লাইনস্ -এর দিকে ।

কেন ? হঠাৎ ? যান তো না কোনোদিনও ।

বলেছিলেন হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে প্রায়ই । বাতেরই মতো । এবার থেকে রোজই সকাল-বিকেল নিয়মিত মাইল দুয়েক করে হাঁটবেন । মামাবাবু বলে গেছেন ।

কে ? গিগি বললো ।

মামাবাবু ।

ও । ভৃগু বললো ।

ভালো । গিগি বললো । যতদিন বাঁচা যায়, সুস্থ শরীর-মনে বাঁচাই তো ভালো । ফিট হয়ে । আমার মেজ মামার মতো ।

ভৃগু, মুখ ঘুরিয়ে তাকালো গিগির দিকে । তারপর বললো, টুটু কোথায় ? তাকেও তো দেখছি না । মায়ের সঙ্গে গেছে ?

শ্রাবণীদের বাড়িতে আছে টুটু ।

গিগি বললো । অভিযোগের স্বরে ।

কেন ?

আজকাল তো টুটু ওখানেই থাকে বলতে গেলে ।

মা কি করনে তাহলে ?

বলেই, ভৃগু ভাবলো, আজ এসব কথা নয় । ঝুনুটা চলে গেলো । 'ভৃগুদা' 'ভৃগুদা' করতো খুবই । একদিন বাড়িতে নেমন্তন করে শর্ষে-মুরগী খাইয়েছিলো । কখনও খায়নি তার আগে

গিগি বললো, ইংরিজিতে : যাতে বাটুমা না বুঝতে পারে : ইওর মাদার ইজ এনথ্রাইড উইথ মাই আংকলস লেটারস । এন্ড শী রাইটস টু হিম অ্যাজ ওয়েল । শী ইজ ইন আ ড্রীম ; আস্পেল । শী ইজ ইন লাভ অ্যাট দ্যা রং এন্ড অফ লাইফ ।

লাভ ?

চিঁড়ে ভাজা খেতে খেতে, ভৃগু আঁৎকে উঠে বললো । লাভ ? মাই মাদার ! আর উ্য ক্র্যাজী অব হোয়াট ? আজকে ঠাট্টা-তামাশা করার মতো মনের অবস্থা নেই আমার ।

বিরক্ত, ক্লান্ত গলায় বিষণ্ণ ভৃগু স্বগতোক্তির মতো বললো ।

আই অ্যাম নট । শী সার্টেনলি ইজ আ চেঞ্জড পার্সন ।

মাই ফুট ! স্টপ ইট গিগি । আফটার ওল শী ইজ মাই মাদার । তাছাড়া বললামই তো নট টু-ডে । আই অ্যাম ইন নো-মুড ট্যু ডিসকাস এনীথিং ।

শী সার্টেনলি ইজ ইওর মাদার বাট সো ইজ শো মাইন । বাই ম্যারেজ ।

রুক্ষ গলায় বললো গিগি ।

ভৃগু একটু অবাক হয়ে তাকালো গিগির দিকে । যার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী এমন হঠাৎ মারা গেছে কয়েক ঘন্টা আগে, সে কী করে এইসব দিয়ে আলোচনা করতে পারে তা বুঝতে পারলো না ।

চা-খাওয়ার পর ভৃগু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়েই ওরা ঝুনুদের বাড়ির দিকে চললো ।

গাড়িতে ভৃগুর পাশে বসে গিগি বললো, আজ বাটুমাকে চিঠি পোস্ট করতে পাঠিয়েছিলেন মা । কাল সন্ধ্যে বেলায় মেজ'মামার চিঠি পাবার পরই নাকি দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন । এই বয়সে প্রেমে পড়লে অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয় । বিশেষ করে মেয়েদের ।

তাই-ই ?

চিন্তান্বিত এবং বেশ বিরক্ত গলায় বললো ভৃগু । কথাটার গভীরে না গিয়েই ।

বিরক্তিটা মায়ের উপর না নিজেরই উপরে তা নিজেই বুঝলো না ।

কী লিখতে পারেন তোমার মেজ'মামা ? আমার মাকে ?

কী আর লিখবেন ? ভালোবাসি-টালোবাসি হয়তো লিখেছেন হয়তো নইলে মা এইরকম রুনু-ঝুনু করতেন না ।

রুনু ঝুনু ? সেটা কি আবার ?

ঐ হলো । আমার মা বলতেন রিকি-ঝিকি ।

সেটাই বা কি ? রিকি-ঝিকি ?

সেটাই বা কি ? রিকি-ঝিকি ?

বিরক্ত গলায় বললো ভৃগু । স্টীয়ারীং ঘুরিয়ে মোড় নিতে নিতে । আমরা যখন কলেজে পড়ি, বাড়িতে কোনো হ্যান্ডসাম পুরুষ এলে মা বলতেন বোকামী কোরো না । এই বয়সে ঐরকম একটু রিকিঝিকি হয়ই । জীবনটা জুয়া নয় । মাথা ঠাণ্ডা রেখে, ভালো মতো ভেবেচিন্তেই যা করার করবে ।

তাই-ই তো করেছো ।

তাই-ই তো করেছো ।

ভৃগু আরও বিরক্ত হয়ে বললো ।

যা করেছি তা আমিই জানি । মা-বাবাতো জলেই ফেলেছেন । তারপরই বললো, একটা কথা মনে রেখো, তোমার মা আর আমার মেজমামার চরিত্রে তফাৎ আছে ।

থাকাই তো স্বাভাবিক । সব মানুষের চরিত্রেই কি একরকম হয় ? না, হওয়া উচিত । তাছাড়া তোমার মেজ'মামা অনেকই ট্রাভেল করেছেন । দেশে-বিদেশে । ওঁর হাবভাব অনেকটা সাহেবদেরই মতো । আই লাইক হিম । আ গ্রেট-গাঈ । তবে হঠাৎ চরিত্রর কথা কেন ?

গিগি চুপ করে রইলো ।

ভৃগু বললো, পুরোদস্তুর সাহেব । কিন্তু একটু, ভিতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, যে আসলে পুরোপুরিই একজন বাঙালী । তোমাদের বাড়ির অন্যদের মতো ট্যাশ-মার্কা নন মেজো'মামা ।

হ্যাঁ । মনে হতে পারে তা, তবে ঐ বাইরে থেকেই । আমার মেজমামা একেবারেই তেতো-বাঙালী নন । তোমার মা হয়তো এই সাহেবী, উইডোয়ার হ্যান্ডসাম পুরুষ মানুষকে রেজিস্ট

করতে পারেননি। প্রেমের কামড় কামের কামড় যে বড় কামড়। কামটের কামড়েরই মতো। একবার দাঁত বসালে আর ছাড়ানো যায় না।

দ্যাখো, গিগি। আমার মায়ের সম্বন্ধে এরকম আলোচনা তুমি করো এটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। তুমি কী মনে করো নিজেকে?

তুমিও আমার মামার সম্বন্ধে কোনোরকম আলোচনা করো তা আমার পছন্দ নয়। তুমিই বা কি মনে করো নিজেকে।

কেন? আমি তো প্রশংসাই করলাম তোমার মামার।

আমার মামার প্রশংসা করার তুমি কে?

বিহেভ ইয়োরসেল্ফ গিগি।

বিরক্ত গলায় বললো ভৃগু।

ওক্কে। এনাফ ইজ এনাফ। ঠিক আছে গেলে তো মা-টি তোমারই যাবে। আমার আর কি কি? আমার তো মামা। এক মামা গেলে অন্য মামারা থাকবেন। তোমার মা তো মাত্র একটিই। মাত্রই একটি।

গীয়ারটা শিফট করবার সময় নিজের রাগটাকেও শিফট করে দিলো গীয়ারের উপর ভৃগু। সেটা কাঁই-কাঁই করে আর্তনাদ করে উঠলো।

ভৃগু বললো, প্লীজ স্টপ দিজ ডিসকাসন্।

ওক্কে। আমাকে দোষ দিও না কিন্তু। পরে সিচুয়েশান হাতেই বাইরে চলে যেতে পারে।

কেউ কাউকে ভালোবাসুক তা যেন একেবারেই সহ্য হচ্ছে না গিগির। ভালোবাসার কথাতেই গা-জ্বালা করছে ওর।

ও বলল আবার স্বগোতক্তির মতো; আমার কি? কোনো আপত্তিও নেই আমার। তুমি রাজী থাকলে বলো, আমার মেজমামা ফিরে এলেই তোমার মায়ের সঙ্গে বিয়ে দেবো। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে উলু দিয়ে বর উঠাবো বাড়িতে। ঝুনুর বিয়েতে তো বেনারসী পরা হলো না, শাশুড়ীর বিয়েতেই পরে সাধ মেটাবো। বাসর সাজাবো আড়ি পাতবো। শয্যাভুলুনীর টাকা চাইবো। নতুন গন্ধর পারফ্যুম আর পাউডার-মাখা নববিবাহিত মামা-কাম-বাবা এবং শাশুড়ী-কাম-মামীমার সঙ্গে ম্যাটিনীতে সিনেমায় যাব। চওকের দোকানে গিয়ে ভেলপুরী আর গোল-গাপ্পা খাব। আমি .....

এবারে ভৃগু সত্যিই রেগে গেলো। গাড়ির গতি কমলো। এই উত্তেজিত অবস্থাতে হাতে স্টিয়ারিং থাকলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।

ও বললো, আচ্ছা গিগি! ঝুনু আজই এমন করে চলে গেলো। তোমার বন্ধু, কলীগ মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে। তারই বাড়িতে আমরা যাচ্ছি অথচ তোমার কি আলোচনার আর কোনো বিষয়ই নেই। তুমি মানুষটা ঠিক যেন কোন্ ধরনের আজ অবধি-ও বুঝে উঠতে পারলাম না। তাছাড়া, আমার তোমার জেনে রাখা দরকার যে, তোমার মামাকে তুমি কী চোখে দেখো, তা আমি জানি না, কিন্তু আমার বিধবা মা আমার কাছে অনেক বড়। মা আমাদের কিছুমাত্র উপকারে আসুন আর নাই-ই আসুন, আমার ছেলেকে দেখুন আর নাই-ই দেখুন; আমার মা আমার মাই-ই। তোমারই নানারকম দুর্বুদ্ধিতে মাকে যথেষ্ট সম্মান কিংবা আদর আমি বাবার মৃত্যুর পর থেকেই করতে পারিনি। তুমিই করতে দাওনি। আদর বা সম্মান করতে পারি না যে, সেটাই আমার কাছে অনেক দুঃখের। মাকে নিয়ে এমন আলোচনা করে তাঁকে এইভাবে অসম্মান অপমান করা আমি বরদাস্ত করবো না। আই উইল হ্যাভ টু কাট উ্য ডাউন টু ইওর ওওন সাইজ।

শাট আপ! হাউ ডেয়ার উ্য!

বলেই জ্বলে উঠলো গিগি।

প্রচন্ড রোদে ড্যাসবোর্ডের উপর ঘুষি মারলো গুদুম করে। ওভার-টেক-যাওয়া গাড়ির যাত্রীরা চমকে তাকালো জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঐ চিৎকারে।

দাঁতে দাঁত চেপে, স্বর যথাসাধ্য নামাবার চেষ্টা করে গিগি বললো, তোমার বাঁদী নই আমি। আমিও রোজগার করি। মনে কোরো না যে, তুমি ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই। ভবিষ্যতে কোনোদিনই এমন ভাষা ব্যবহার কোরো না। নেভার ট্রাই টু কাট মী ইন মাই ওওন

সাইজ। উ উইল গেট স্ল্যাশড ইনস্টেড। বী কেয়ারফুল। আই ওর্ন উ্য। তোমার মায়েদের জেনারেশনের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের অনেকেই তফাৎ আছে। জেনে রাখো।

ভৃগু ফুলের দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নেমে যেতে যেতে নিচু কিন্তু দৃঢ় গলায় বললো, অন্যায়টা অন্যায়ই। অন্যায় আমি সহ্য করবো না। তাতে যা হবার হোক। তোমার বাড়িতে নিজের মা-বাবার প্রতি এইরকম ব্যবহারের শিক্ষাই কি তুমি পেয়েছিলে?

গাড়ি থেকে নেমে দোকানের দিকে হেঁটে যাওয়া ভৃগুকে উদ্দেশ্য করে গিগি চিৎকার করে বললো, খবর্দার। বাড়ি তুলবে না। তোমার বাড়ি আর আমার বাড়িতে তফাৎ ছিলো। থাকবেও।

পথের লোক আবার থমকে দাঁড়ালো চিৎকারে।

বড়ই লজ্জিত বোধ করলো ভৃগু। মনে মনে ঠিক করলো, গিগিকে সত্যিই একদিন ...

গিগি ভাবছিলো, ওকি সত্যিই ভদ্র? নিজে? ভদ্রমহিলা? লেখা-পড়া শিখলেই, ভালো জামা-কাপড় পরলে, গাড়ি চড়লেই কী মানুষ ভদ্রলোক হয়? ও জানে, শুধু রাগ নয়; কাম এলেও ও এমনিই অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যায়। কী করছে জানে না পর্যন্ত। তখন নিজেকে মনে হয় কোনো গুহামানবীই। সভ্যতার অবরণটি কি এত হাজার বছরেও যথেষ্ট পুরু হয়নি মানুষের? অথচ গিগির মা ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টভাষী ঠান্ডা মাথার মহিলা বাবাও চমৎকার স্বভাবের। কোনোদিনও রাগতে দেখেনি। কে জানে কার রক্ত এলো ওর শরীরে, কোন্ পূর্ব-পুরুষের জিন্? বাবাও তো অন্যরকম ছিলেন। তবে বড়ই ম্যাদা-মারা, বইয়ের-পোকা মানুষ। তার মা কি অন্য কারো সঙ্গে শুয়েছিলেন? ওর চেহারাতে বাবা অথবা মায়ের কারোই আদল নেই। বাবা মা দু'জনেই বেঁটে। আর ও খুব লম্বা। চরিত্রেও নেই আদল।

রাগটা হঠাৎ এসে হঠাৎই পড়ে যেতেই ভীষণই লজ্জা করলো গিগির। ওর এইরকমই স্বভাব। মানুষটা খুব ভালো। কিন্তু রেগে গেলে বড়ই খারাপ হয়ে ওঠে।

ভৃগু ফুল নিয়ে ফিরে এসে ফিয়াটের পেছনের দরজা খুলে গুছিয়ে রাখলো সেলোফেন-পেপারে মোড়া সাদা ফুলগুলিকে।

গাড়ি স্টার্ট করেই বললো, কালই তোমাকে নিয়ে ডঃ পান্ডের কাছে যাবো। তোমার প্রেসার চেক করানো দরকার।

উত্তর দিলো না গিগি।

ভাবছিলো ও, ওর স্বামীভাগ্যটি বেশ ভালোই। ভৃগু অন্য কোনো মেয়ে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও ইন্টারেস্ট নেই। গিগিকে কোনো ব্যাপারেই একটুও সন্দেহ করে না। সন্দেহ ব্যাপারটাও যেন বিশেষ কুরুচির ব্যাপার, এমনই মনে হয় ওকে দেখে। স্বীকার করুক আর নাই করুক, ভৃগু তার মায়ের সুন্দর স্বভাব আর বাবার বিচ্ছিরী চেহারা পেয়েছে। প্রত্যেক মেয়েই এমন ভালো মানুষ সরল প্রকৃতির স্বামী চায়। নিপাট ভালো অথবা বোকারা দারুন ভালো স্বামী হয় চালাক মেয়েদের।

চিকি শ্রীবাস্তবই গিগির জীবনের দ্বিতীয় পুরুষ নয়। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম আছে। এই জব্বলপুরেই। গিগি যাই-ই বলুক, যাই-ই করুক সবই অবশেষে মেনে নেয় ভৃগু। যদিও ভৃগুর এই সব কথা জানার নয়, কিন্তু গিগির চরিত্র সম্বন্ধে ও কোনোদিনই সন্দেহ করে না কোনো। ভৃগু নিজে যেন ভাবতেই পারে না যে, ওর নিজের মধ্যেও কোনো অপূর্ণতা থাকতে পারে। কোনো পুরুষই যে পূর্ণ নয়, নয় যেমন কোনো নারীই; এই সত্যটা ওর ভাবনারও বাইরে। এই নিজের সম্বন্ধে ওভার-কনফিডেন্ট স্বামীরাই ভালো। দে মেক দ্যা বেস্ট অফ হ্যাজব্যান্ডস্।

ভৃগুর সঙ্গে ঝগড়া করবে না আর গিগি। কিন্তু ঐ বুড়ির প্রেম করা ঘোচাবে। মেজমামাকেও বলিহারী যাই! কী এমবারাসিং ব্যাপার।

ভৃগু বললো, আমি সত্যিই জানি না চিকিকে কী করে ফেস করবো গিয়ে। কী বলে সান্ত্বনা দেবো ওকে। ছেলেটা আত্মহত্যাই না করে বসে। তুমি কিছুদিন ওকে একটু কম্পানী দিও। প্রয়োজনে ওর বাড়িতেও গিয়ে থেকো। ইী নিডস উ্য ন্যাউ।

গিগি ভৃগুর স্বগতোক্তির কোনোই উত্তর দিলো না। চুপ করে বাঁ-দিকের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো। বুক কেঁপে উঠলো ওর। ভৃগু কি জানে?

ঠিক করলো, ঝুনুর বাড়ি থেকে ফেরার সময় ও চিকির সঙ্গেই ফিরবে। ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে ওকে ভালো করেই সান্ত্বনা দেবে। পুরুষের ক্রোধ, পুরুষের লোভ, পুরুষের শোকের অবসান

অবলীলায় শুধুমাত্র বিছানাতেই ঘটে। ওর শোক ভুলিয়ে দেবে গিগি। বেচ্চারা চিকি। সুইটি-পাঈ! ওকে বুঝিয়ে দেবে যে, ঝুনু না থাকলেও ওর সুহৃ সুখী জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবে না। গিগিরা আছে। গিগির মতো বান্ধবী। ভৃগুর মতো উদার, ওয়েল-মীনিং কনসিডারেট বন্ধু।

ঝুনুদের বাড়ি পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতে নামতে চিকির প্রতি মন খুবই দ্রব হয়ে আসায় একবার গিগি ভাবলো, চিকিকে বিয়ে করলে কেমন হয়?

নট আ ব্যাড আইডিয়া! টুটুকে যদি ভৃগু না দেয়, নাই-ই দিলো। ক্যুডনট কেয়ারলেস! টুটুর চেয়েও সুন্দর একটি খেলনা তৈরী করে নেবে ও আর চিকি মিলে। দশটি মাসেরই তো ব্যাপার! এত খিচ্-খিচ্, এই সিক্সটিফাইভ-মডেলের ধ্যাড়ধেড়ে ফিয়াট বসে রোজ রোজ আর সহ্য হয় না। জীবনটা বিয়ের পর এই ক'বছরেই বড় এক ঘেয়ে হয়ে গেছে। প্রচণ্ড স্বচ্ছলতা না থাকলে, বেঁচে লাভই নেই!

॥ ৬ ॥

আজ দশদিন হয়ে গেলো শুভাশিস গেছেন।

বলেছিলেন, পনেরো-কুড়িদিন পরই ফিরে আসবেন। নলিনী এ পর্যন্ত চিঠি পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে তিনটি। উত্তর দিয়েছেন দুটির। আর তৃতীয় চিঠির উত্তর দেবেন।

শুভাশিস মুক্তির ফরেস্ট লজ্ - এই আছেন। অন্য কোথাও আর যাবেন না লিখেছেন। তাই চিঠি লিখতে নলিনীর কোনোই অসুবিধে নেই।

নলিনীর জীবনে এত চিঠি এবং এমন দীর্ঘ চিঠি উনি আর কাউকেই লেখেননি। আর পাবার কথা তো জানাই। চিঠি পেতে যে এতোই ভালো লাগে, ডাক-পিওনের নাগরা-পরা পায়ের শব্দের জন্যে যে ওঁকে এমন উৎকর্ণ হয়ে সারাটি দিন অপেক্ষা করে থাকতে হবে এ-কথা অল্প ক'দিন আগে তাঁর ভাবনার বাইরে ছিলো। বহুদিনের পরিচিত এই অকিঞ্চিৎকর মানুষটিই এই ডাকপিওন : আজ বড় বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে। যেমন হয়ে উঠেছেন উনি নিজেও নিজের কাছে। চিঠি যখন সেই খাকি-পোশাকে পরা মানুষটি হাতে করে আনে, তাকে মাল্যবানই করে দিতে ইচ্ছে যায় নলিনীর।

সবকিছুরই বড় ভালো লাগে এখন। নতুন করে ভালো লাগে সবকিছুই। ভোরের রোদ, খোকা ও বৌমার ঝগড়া, খুনসুটি; টুটুর দুরন্তপনা, বাটুমার ছিঁচকে চুরি। পড়ে-আসা আলোয় দ্রুতগামী পাখিদের বাসায়-ফেরা ডানার শব্দ; কলকাকলী। জীবন যে এই সব আপাততুচ্ছতারই এক ব্যস্ত সমষ্টি, বিভিন্ন যন্ত্রীর হাতের বাজনাতে ঝংকৃত এক অনিকেত অর্কেষ্ট্রা; এ সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিলো না আগে।

যদিও দিন শেষে এসে পৌঁছেছেন, তবুও বাঁচতে বড় ভালো লাগে এখন। এতদিন মৃত্যু-চিন্তা করেছেন; এখন ইচ্ছে করে দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা জানাতে।

শুভাশিস সম্বন্ধে খাওয়ার টেবিলে যেসব কথা ছেলে-বৌ আলোচনা করেছিলো নলিনী চিঠিতে তার উল্লেখ করেছিলেন। মেয়েলি নালিশ-করা মেনোবৃত্তি তাঁর কোনোদিনও ছিলো না। কিন্তু তবু লিখতে হয়েছিলো শুভাশিসের সম্মানের কথা ভেবেই। উনি অপমানিত হন কোনোভাবেই, তা নলিনী একটুও চান না। ছেলে-বৌ তাঁকে যা বলে বলুক। ওঁকে বললে বড় লাগে।

নলিনীর সেই চিঠি পাওয়ার পর শুভাশিস লিখেছিলেন : "ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না বেয়ান। মানুষের জীবনে দ্ররিদ্রেরই মতো ঐশ্বর্যও মস্ত হীনমন্য, হা-ভাত; ঈর্ষাকাতরদের দেশে। এদের বেশিরভাগই না পারে দিতে; এমন কি না জানে নিতেও।

সকলকে ভালোবেসে, সকলের জন্যে করে, বদলে এই জীবনে যা পেয়েছি বেয়ান তা নিজের মনে রাখাই ভালো। মুখে বা চিঠিতে প্রকাশ করলে, নিজেকেই ছোট করা হবে। যারা দুঃখ দিয়েছে, এখনও দেয় নানা রকম, হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতার পরিবর্তে, যাঁরা শৈতাই দেয় তাদের ক্ষমা করাই সবচেয়ে ভালো। ক্ষমা যে করে, তার যা আনন্দ, সেই ক্ষমা যে পেলো সেই পাপকের আনন্দর চেয়ে তা অনেকই বেশী গভীর।

তাছাড়া এও তো অস্বীকার করার উপায়ে নেই যে, আপনার জন্যে করাটা তো আমার মস্ত অপরাধই সকলেই তাই বলবে। সংসারে একজন অনাত্মীয় পুরুষ একজন নারীর জন্যে কিছুমাত্রও করলেই সেই করার পেছনে যে "কিন্তু" "অবশ্যই" "আছে" সে সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী

আগেভাগেই পুরোপুরি নিঃসন্দেহ'হয়ে থাকে। যাচাই করার কষ্ট স্বীকার না করেই যারা বাতিল করতে বদ্ধপরিকর তাদের সঙ্গে আর যাই-ই করা চলুক, তর্ক তো করা চলে না। তারা নিজেরা যেহেতু কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য অথবা স্বার্থ ছাড়া কারো জন্যেই কিছুমাত্র করার সঙ্গতি, এমনকি, মানসিকতা পর্যন্ত রাখে না ; অন্য কেউই তা করতে পারছে বা করছে তা দেখলে সুস্থ মনে তা মেনে নেওয়া বড়ই অপমানকর বলে ঠেকে তাদের কাছে। তাছাড়া এই না-করার দেশে কিছুমাত্র করতে যাওয়াটাও তো অপরাধেরই !

বেয়ান, এ সব তো আছেই। থাকবেও। আপনার জীবন, আপনার নিজের আনন্দ এই সব ছোটো কথায়, ছোটো মানসিকতায় কখনওই ক্লিষ্ট করবেন না। আপনার জীবন আপনারই। সমাজ-সংসারের শত-কর্তব্য পালন করেও নিজের জীবন ও নিজের নিজস্বতাকে যে মানুষ অটুট না রাখেন তবে বুঝতে হয় যে সেই মানুষের মনুষ্যত্ব বোধহয় সম্পূর্ণ পায়নি। নিজের জীবন, নিজের অন্বিষ্ট, আনন্দ অন্যর করনির্ভর হবেই বা কেন ? তা হতে দেওয়াটাও নিশ্চয়ই ভীরুতা।

বেয়ান আপনার শেষ চিঠিতে আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি তো চাকরী করতাম না কারোই, তবু এত তাড়াতাড়ি কাজ ছেড়ে দিলাম কেন ?

আপনার এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তরে বলি যে, আমার জীবনে প্রাচুর্য্যর সত্যিই কোনো শেষ ছিল না ! অল্প ক'দিন আগেও নয়। অর্থ এবং যশ, মান অথবা সম্মান কিছুরই। তবু, সীমা বেঁচে থাকতে থাকতেই আমি নিজেকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। মান এই অনবরত দৌড়। সীমার খুবই ক্ষোভ ছিলো সে-কারণে। ক্লাবে, পার্টিতে, সকলেই জিজ্ঞেস করতো ওঁকে : শুভাশিস কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন ? এই বয়সে কেউ এমন রমরমে প্রফেশন ছাড়ে ? এখনই তো সময়। "হারভেস্টিং"-এর। আর প্রফেশানে তো "শেষ" বলে কিছুই নেইও। সীমা নেই কোনো। "স্কাই ইজ দ্যা লিমিট।"

নানা লোকের বলা ঐসব কথা শুনতে সীমার মোটেই ভালো লাগতো না। ওঁর নিজের মনের আগুনই ঐসব কথার হাওয়াতে আরো জোর পেতো। আমাকে বারে বারেই বলতেন, গভীর অনুযোগের সঙ্গে ; তুমি যে কী করলে ! কেউ এমন হুট করে প্রফেশান ছেড়ে দেয় ?

ওঁর কথাতে আমার মনে হতো যে, এ দেশে যা-কিছুই করে অর্থাগম না হয়, সে-সব বুঝি করা-কবির মধ্যেই পড়ে না। কথাটা সীমার একারই ছিলো না। এ কথাটা সকলেরই কথা। এখন বুঝি।

আমি ওঁকে হেসে বললাম, সময় মতো কোনো কিছুকেই ছাড়তে পারাটাওতো একটা আর্ট। বলো ? তাই-ই না ? গলা বেসুরো হবার আগে, শ্রোতারা টিট্‌কারী শোনার আগে কোনো বড় গায়ক বা গায়িকাই এ গান ছাড়েন না। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই এ দেশের বেশিরভাগ মানুষই উচ্চাসনে একবার বসতে পারলে তাতে আজীবন আঠারই মতো সেঁটে থাকতে চান। কোনো আসাই যে কারো চিরকালের জন্যে নয় এই সহজ কথাটাও তাঁদের বোঝার মতো শুভবুদ্ধি থাকে না। যশের নেশা, অর্থের নেশা, ক্ষমতার নেশা বড়ই সর্বনেশে নেশা। আমি হয়তো মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমীদের দলেই। বলতাম সীমাকে আমাকে তুমি সাধারণ ভালো কেন ?

সীমা তবুও মানতে পারতেন না আমার কথা। চুপ করেই থাকতেন আসলে, খুব কম নারীই অসাধারণ মানুষের ঘর করার যোগ্যতা বা ইচ্ছা রাখেন বেয়ান। অসাধারণ পুরুষদের ছবিই তাঁরা ঝোলান দেওয়ালে, মনে মনে প্রেম নিবেদন অথবা পুজোও করেন। কিন্তু তা তাঁদের যা সামান্যতম প্রয়োজন সেটুকু তাঁদের দেন না।

বেয়ান, আপনি রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন" পড়েছেন কি ভালো করে ? "শান্তিনিকেতন" শিরোনামে অনেকগুলি প্রবন্ধই প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষকে ভাবতে শেখায় ; তাদের ধূলিমলিন পর-পথ অনুসরণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে হয়তো প্রতিহত করতে শেখায়।

'শেষ' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ আছে শান্তিনিকেতনে। জানি না, পড়েছেন কি না। তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"আমাদের দেশে বলে : পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ। কিন্তু বনতো আলস্যের বন নয়, সে যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। কারার আদর্শ মানুষের একমাত্র নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো জিনিষ।"

অনেক দিন অবধি দৌড়েছি অর্থ, যশ, প্রভাব প্রতিপত্তির জন্যে। ভাবলাম এবার থামতে চেষ্ট করি। দৌড়নো কঠিন। কিন্তু থামাটা আরোই কঠিন।

এ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন : "যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধূমধাম করে যে ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে -- তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল একদিকে থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়। মানুষের থামতে লজ্জা বোধ করে। সেই জন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে জিন-লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যেস করছি। কোনো একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে, এ কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই একমাত্র গৌরবের জিনিষ বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

... জীবনকে যারা এই রকম কৃপণের মতো দেখে, তারা কোথাও কোনোমতেই থামতে চায় না, তারা কেবলই বলে চলো, চলো, চলো।

থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না ; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না ...

অধিকারকে যেমন করতে পারি শেষ পর্যন্ত টানা-হেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে - তাতেই আমার সম্মান, আমার কৃতিত্ব এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিক্ষে এসেছে, অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।"

বেয়ান এমন সব মানুষই আমাদের দেশে বেশি। ব্যবসা বলুন, পেশা বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, গানের জগতে বলুন, "দুহাতে আসন আকঁড়ে পড়ে থাকা" লোকেদেরই বড় বেশি ভীড় এখানে।

"আমাদের দেশ অবসানকে স্বীকার করে এই জন্যে তার মধ্যে অগৌরব" দেখতে পায় না। এই জন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়। কেন না সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারিনে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্তন হয় সেখানে অজ্ঞাতবাসের পলয়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।"

নলিনী স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন অনেকক্ষণ চিঠিটি হাতে হাতে নিয়ে, জানালা দিয়ে বাগানে চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু-উপন্যাস, গল্পগুচ্ছর কিছু গল্প, গীতবিতান, চয়নিকা এসব তিনি পড়েছিলেন। কিন্তু এই সুদূর প্রবাসে তো এই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় শুভাশিস ছাড়া অন্য কেউই করিয়ে দেননি।

কী করে যে কৃতজ্ঞতা জানাবেন, ভেবেই পান না। নলিনীর তো নিজের ভাষা নেই এমন, নিজের পড়াশুনা বিদ্যেবুদ্ধিও তো অতি সামান্যই শুভাশিসের তুলনায়।

অন্য কোনো গুণ তো নেই, গাইতে পারেন শুধু একটু গান, শুভাশিস ফিরলে তাঁর ফরমাসী গান অন্তত শোনাতে যাতে পারেন সেই ইচ্ছেটুকু নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর খোকা আর বৌমা শুয়ে পড়লে এ ক'দিন রোজই রাতে অর্গানে বসছেন তিনি। টিউন করার পর অর্গানটা যেন নুতন প্রাণ পেয়েছে। আজ রাতেও ; ড্রইংরুমে বসে নিচু গলায় গান ধরলেন।

দুটি জানালা খুলে দিয়েছেন। নইলে শ্বাসকষ্ট হয়। জানালা দিয়ে দেখা যাওয়া পথের আলো-পড়া বাগানের গাছেরা, আর আকাশের তারারই যেন তাঁর সেই একা-ঘরের সব গানের নীরব শ্রোতা।

অতুলপ্রাসাদের একটি গান ধরলেন। ওঁর বড় প্রিয় গান।

"আমার বাগানের এত ফুল, তবু কেন চলে যায় ? তারা চেয়ে আছে তারি পানে সে তো নাহি ফিরে চায়।

ভুলে কি গিয়েছে ভোলো প্রভাতেরও ফুল তোলা জানে না পরিতে সে কি কুসুম গলায়?"

আঁখির শিশির পাতে ফুটেছে তারা প্রভাবে শুকাইয়া যাবে তারা সাঁঝের বেলায়। নিশির ঘন তিমিরে যবে সে আসবে ফিরে চরণ করিব রাঙা নিঠুর কাঁটায়।

আমার বাগানে এত ফুল কেন যায় ....।

খাম্বাজে বাঁধা এই গানখানি রাতের মধ্যযামে যেন তাঁর আর্তিকে মূর্চ্ছনায় ভরে দিয়ে আকাশের দিকে তারাদের দিকে ছুটে যাচ্ছিলো।

হঠাৎই পিছনে শব্দ শুনে চমকে চেয়ে দেখেন গিগি এসে বসেছে সোফাতে।

তুমি ? ঘুম ভাঙালাম ?

অপরাধীর গলায় শুধোলেন নলিনী।

না মা। আরেকবার গাও না গানটা। গান শুনে উঠে এলাম কার গান এটা ?

অতুল প্রসাদের।

তোর গান ভলো লাগে তো নিজে গাস না কেন ?

আমি তো এসব গান কখনও শুনিনি। মাকে বড় বেলাতে পাইনি কখনওই কাছে। শুনেছিলাম মা খুবই ভালো গান গাইতেন। মামা বাড়িতে অবশ্য এ সবের চর্চা ছিলো। বাবা অজ্ঞান, অ-গান মানুষ ছিলেন। এখন দুঃখ হয় যে, আমরা শুধু ইংরিজি গানই শুনি এবং গাইও একটু-আধটু। ইমপ্রেশানেবল্ এজ এ এইসব গানের সঙ্গে পরিচয় কেউই করিয়ে দেয়নি। যে-বয়সটা সবচেয়ে দামী। এখন বুঝি, মাতৃভাষার গান এসবের কোনোই সাবস্টিট্যুট, নেই। তাই না ? সোজা কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পৌঁছয়।

নলিনী মুগ্ধ চোখে তাঁর অপরূপ সুন্দরী পুত্রবধূর মুখে চেয়ে রইলেন। সৌন্দর্য্যরও, অর্থরই মতো, একটা আলাদা দাম আছে। হঠাৎই যেন আবিষ্কার করলেন এতো বছর পরে।

গিগি বললো,

তুমি এতো ভালো গান গাও তো এতো বছর এতো গান বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখলে কি করে ? কষ্ট হতো না ?

হাসলেন নলিনী গিগির কথা শুনে।

বললেন, হতো না তা নয় হতো। তবে কষ্ট জমে থাকা ভালো অনেক জমা হলেই একদিন তা আনন্দর ঝর্ণা হয়ে উৎসারিত হয়।

আমাদের বিয়ের আগেও তো তুমি গাইতে গান। মিছিমিছিই কি তোমার বাপের বাড়ি থেকে অর্গানটা নিয়ে এসেছিলে ? তবে ?

হলে কী হয়। স্বাধীনতা ছিলো না। আমাদের সময় তো আর তোমাদের সময়ের মতো ছিলো না। তোর শ্বশুর মশায়ও এসব পছন্দ করতেন না। আমার তো কোনোরকম স্বাধীনতাই ছিলো না আমরা ছিলাম ক্রীতদাসীরই মতো। তুই যে রোজগার করিস, অর্থনৈতিকভাবে তুইও যে স্বাধীন গিগি, এটা আমার খুবই ভালো লাগে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্য কোনো স্বাধীনতাই সম্ভব নয়। আমার ছেলে কোনোদিন তোর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে, তোকে তোর ন্যায্য সম্মান না দিলে তুই বিদ্রোহ করতে পারিস। নিজের যাকে ভালো লাগে, যে-জীবন ভালো লাগে তাকে এবং সেই জীবনকে নতুন করে পেতে যে পারিস পুরনো জীবনকে বাসি-শাড়ির মতো ছেড়ে ফেলে এইটে ভাবলেই আমার ভারী আনন্দ হয় সত্যি। স্বাধীনতা যে আছে এই জানটার মধ্যেও একটা মস্ত আশ্বস্তি।

স্বাধীনতা ব্যবহার না করতে পারলে জানা যাবে কি করে যে তা আছে ?

অবাক গলায় বললো গিগি।

যাবে। পুলিশ সার্জেন্টদের কোমরের রিভলবার তাঁরা জীবনে খুব কি ব্যবহার করেন ? কেউ হয়তো সারা জীবনে একবারও করেন না, কিন্তু সেটা যে কোমরে আছে ; প্রয়োজন হলেই তা ব্যবহার করা যে যেতে পারে এই ভাবনাটাই তো অনেকখানি।

তোমার কোমরে কি ছিল মা ?

হেসে বললো, গিগি।

আমার কোমরে ছিলো সংসারের চাবি। এত বছর বয়েছি। আজও বয়ে চলেছি। ভাঁড়ারের, আলমারীর, পেতলের গেটের, বারান্দার, কোলাপসিবল গেটের-মেইন গেটের ; বয়ে চলেছি। কুড়ি বছর বয়স থেকেই। তুই ইচ্ছে করলেই গিগি সৌখিন তোর রূপোর রিং-এর চাবির গোছা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে পারিস। আমি পারি না। চাবিই আমার শেকল !

আমরা তোর মা-জেঠিমা শাশুড়ীরা সবাই-ই ঐরকমই ছিলাম। গিগি মা। কয়েদীর মতো বেড়ী-পরা অভ্যাসের দিনযাপনই করে এসেছি শুধু। বাঁচা একটুও অন্যরকম হতে পারতো, বাঁচা মানে যে শুধুই স্বামী-সেবা নয়, স্বামীর হাতে পুতুল হয়ে দিন কাটানো নয়, জীবন যে আরও বড়, অন্যরকম কিছু, তা তোর মেজমামাই আমাকে প্রথম বুঝিয়েছেন, ওঁর চিঠির মধ্যে দিয়ে আমি এক আশ্চর্য উদার খোলামেলা জগতের আভাস পাচ্ছি।

কী বললো, কী করে বলবো। মানুষটির কাছে আমি বড়ই কৃতজ্ঞ। তাই-ই ? নলিনীর দু চোখে চেয়ে স্বগতোক্তির মতো গিগি বললো। আমার জীবনের বাকি আর কীই-ই বা আছে ? এই জীবন নিয়ে নতুন করে কিছু বলার তো আমার নেই। বলেই, চুপ করে গেলেন নলিনী।

এতক্ষণ চুপ করেই থাকলেন।

গিগিও চুপ।

রাস্তা দিয়ে দু'জন লোক একই সাইকেলে জোরে কথা বলতে বলতে নিস্তব্ধ রাতকে চমকাতে চমকাতে চলে যাচ্ছিলো।

নলিনী হঠাৎ বললেন, আমরা যা করলাম, তোরা তা করিস না। ভুণ্ড আমার ছেলে তো কী ! তোর জীবন তোরই। নিজের মতো করে বাঁচিস জীবনে। এখন, এতদিন বাদে মনে হয় জানিস, আমাদের সমাজে বিয়েটা একটা বন্ধন। কে জানে ? হয়তো কারো কারো কাছে মুক্তিও নিশ্চয়ই হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি তা না হয়ে ওঠে তবে সে বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে দু'বার ভাববি না। ভালো-খাওয়া ভালো-পরা আর সমাজের মেডেল পেয়ে ভালো স্ত্রী হয়ে জীবন কাটানো আর বাঁচার মতো বাঁচা এক কথা নয়। এই সমাজ তোকে দেবে না কিছুইরে গিগি, এই সমাজের মেডেলের কারো লাভ হয় না কিছু মাত্রই। তবু, তুই যদি একে উপেক্ষা করিস তাহলেই দেখবি শকুনের মতো তোর উপর পড়ে এরা তোর মাংস ছিঁড়বে। সমাজের প্রয়োজন একলা মানুষ, মানে ব্যক্তি মানুষের কাছে একদিন হয়তো ছিলো ; আজকে একেবারেই নেই। ব্যক্তি, যদি তার নিজস্বতায় তার ব্যক্তিস্বরূপে ফুটেই না উঠতে পারলো তার নিজের জীবনে, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মানোই বোধ হয় তার বৃথা।

গিগি নলিনীর কাছে এসে, অর্গানের পাশে দাঁড়ালো।

বললো, মা। তোমার জীবনে আর কিছু নেই এমন বলছো কেন ? যে গানটি তুমি গাইছিলে কিছুক্ষণ আগে, আমি শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম, সেই গানের শেষ কথাকটি তো এই-রকমই ? তাই না ? "এখনও যা-কিছু আছে তুলে লহো তব কাছে রাখো এই ভাঙ্গা নায়ে চরণ তোমার।" তবে ?

চুপ করে গেলেন নলিনী। একটু থতমতও খেয়ে গেলেন।

অস্ফুটে বললেন, তবে, ...

গিগি কথা ঘুরিয়ে বললো, কোনো প্রেমের গান জানো না তুমি মা ?

প্রেমের গান ?

বলেই গিগির দিকে চাইলেন। মুখ নামিয়ে নিলেন। অনেকক্ষণ কথা বললেন না।

অনেকক্ষণ পর যেন ভেবে-টেবে বললেন ; এও তো প্রেমের গানই। ব্যক্তির প্রেমই তো পূজোতে গড়িয়ে যায়। যে মানুষকে ভালো বাসতে পেরেছে শুধু তার পক্ষেই ঈশ্বরকে ভালোবাসা সম্ভব।

একটা প্রেমের গান গাওনা মা।

প্রেমের গান ?

আবারও চুপ করে গেলেন নলিনী। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। প্রেমের গান কথাটা শুনেই এমন লজ্জা পাচ্ছেন কেন উনি ? এমন তো হয়নি কখনওই।

বাইরের কার্তিকের গভীরে রাতের বাগান থেকে কুয়াশার, শিশিরের, গাছেদের ডালে ডালে নিজের মধ্যে গা-ঘেঁষাঘেষি করে ঘুমিয়ে-থাকা পাখিদের ডানার পালকের আর আমের আঁশটে গন্ধ, গাছ-গাছালির গন্ধের সঙ্গে মিশে তাঁর নাকে ভারী হয়ে এলো। পিছনে ফেলে-আসা জীবনটা কুয়াশারই মতো স্পষ্ট হয়ে এলো। পিছনে ফেলে-আসা জীবনটা কুয়াশারই মতে স্পষ্ট হয়ে এলো চোখের সামনে। কোথাও এখন ভোর হচ্ছে বোধ হয়। আলো ফুটছে পাচাড়তলীতে, পাখি ডাকছে, ঝর্ণা বয়ে চলেছে কুলকুলিয়ে। ভাবে বিভোর হয়ে, আত্মহই হয়ে

গেলেন নলিনী ! কী যে হলো তাঁর কেন যে এমন হলো অনেকক্ষণ পরে, বাস্তবে ফিরে অর্গ্যানের রীডে আবার আঙুল রাখলেন তিনি।

গিগির দিকে চেয়ে বললেন, এই গানটা শোন। নিধুবাবাবুর গান। গৌড়মল্লারে বাঁধা। বলেই, গেয়ে উঠলেন অর্গান বাজিয়ে।

"কী হলো আমার সই বলো কি করি ?

নয়ান লাগিল যাহে, কেমনে পাশরি ? কী হলো আমার সই বলো কি করি ?

হেরিলে হরিষচিত, না হেরিলে মরি,

তৃষিত চাতকী যেন যাকে আশা করি।

ঘন মুখ হেরি সুখী, দুখী দিনে বারি। কী হলো আমার সই ? বলো কি করি ? বলো, কি করি ?" অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইলেন নলিনী।

গিগি জড়িয়ে ধরলো ওঁকে গান শেষ হলে।

নলিনী চোখ বুজে ফেললেন। কিছুটা ভালোলাগায় ; কিছুটা লজ্জায়ও।

গিগি বললো, মা আমি কিন্তু তোমার বন্ধু।

বন্ধু ?

অবাক হয়ে অর্গান ছেড়ে উঠে দাঁড়ানেল নলিনী। ঝাপসা হয়ে যাওয়া বাই-ফোকাল চশমার কাঁচ মুছলেন একবার কালো পাড়ের সাদা শাড়ির নরম আঁচলে।

চশমা খুললেই, মায়ের দু'চোখের কোলে যে গভীর ক্লান্তি। বিষণ্ণতা, কালি আর হতাশা মাখামাখি হয়ে আছে সেটা বোঝা যায়। দীর্ঘদিনের অবসাদের পায়ের ছাপ কাকের পায়ের মতো আঁকি-বুঁকি কেটেছে সেখানে।

বন্ধু ?

নলিনী আবারও স্বগতোক্তি করলেন। কিছুই বুঝতে না পেরে !

হ্যাঁ। মা ! আমি বন্ধু তোমার। বন্ধুকে তো মানুষ মনের কথা গ্রামের কথা বলে। সুখের কথা, দুখের কথা, আশার আকাঙ্খার, তার সব স্বপ্নর কথাও। তুমি সেই সব কথা আমাকেই বোলো। একটুও গোপন না করে কিন্তু। আমি তোমার ছেলের বৌ হলে কী হয়, বয়সে অনেক ছোট হলে কী হয় ; আমিও তো আরেকজন মেয়ে। এই দেশে, এই পুরুষদের একাধিপত্যর জগতে একজন মেয়ে যদি অন্য মেয়ের দুঃখ না বোঝে তো কে বুঝবে বলো ? কিছুমাত্র গোপন কোরো না আমাকে। তোমার জন্যে আমি সকলের সঙ্গে লড়াই করবো যদি দরকার হয়।

নলিনী গিগির মুখে চাইলেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। চোখ আবারও ঝাপসা হয়ে গেলো। কুয়াশা। তাঁর চারধারে কুয়াশা। তিনি নিজে কুয়াশা। কুয়াশাই হয়ে গেছেন তিনি। কুয়াশার মধ্যে আগুন জ্বলে না, বিদ্যুৎ চমকায় না।

মনে মনে বললেন, লড়াই ? না না। আমার জন্যে কারোই লড়াই করতে হবে না। যেন, না হয় অন্তত। তাছাড়া, তাছাড়া কিছু কথা থাকে, বলার অনেক লোক থাকলেও যা কাউকেই বলা যায় না। একজনকেও নায় ...।

গিগির কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে গালে চুমু খেলেন নলিনী। বধূ বরণের পর আর এমন করে চুমু খাননি তাকে। গিগি তাঁর বুকের মধ্যে মুখ রেখে কী যেন বললো অস্ফুটে।

বোঝা গেলো না কিছু।

অস্ফুটে নলিনীও বললেন, আমি ফুরিয়ে গেছি, মা। তোরা ফুরোস না।

তারপর না বলেই বললেন, বাঁচিস, বাঁচিস, এই একটা জীবনে মানুষের যেমন করে বাঁচা উচিত তেমন করে বাঁচিস।

রানী দুর্গাবতী কলেজের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

এবারে শুয়ে পড়ো মা। রাত অনেকই হলো। আমি সব আলো নিভিয়ে দেবো ড্রয়িংরুমের। জানালাও বন্ধ করে দিচ্ছি।

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে নলিনী বললেন, সত্যি। অনেকই রাত হলো। আলোও সব নিজেই গেছে। জানালাগুলো তো বন্ধই ছিলো। চিরদিন। এ জীবনে খোলার সময় আর হবে না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নলিনী কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলেন।

কাল বিকেলে যখন হাঁটতে গেছিলেন তখন একটি চিঠি লেখার প্যাড কিনে নিয়ে এসেছিলেন এবং একটি একটাকা দিয়ে বল পয়েন্ট পেনও। প্যাডটির কাগজগুলি নীল। ঐ প্যাডে শুভাশিসকে চিঠি লিখতে লজ্জা করছিলো খুবই। জীবনের রঙ যখন কালো হয়ে এসেছে তখন নীল কাগজে কাউকে চিঠি লিখতে অনভ্যস্ত সংকুচিত মানুষের লজ্জিত তো হয়ে ওঠারই কথা!

মনটাও আজ ভালো ছিলো না। আজই সকালে ঝুনুর শ্রাদ্ধ ছিলো। চিকি এবং মিসেস জয়াকার নলিনীকেও গান গাইতে বলেছিলেন।

ঝুনুরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদের এই ব্যাপারটা ভারী ভালো লাগে ওঁর। বিয়ে এবং শ্রাদ্ধ দুই-ই হিন্দুদের অনুষ্ঠান থেকে অনেকই অন্যরকম। অনেক অনাড়ম্বর, আন্তরিক; সোজাসুজি। বোঝা যায় সহজে।

নলিনী খালি গলাতেই গেয়েছিলেন: "পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই - সবারে আমি প্রণাম করে যাই। ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবী করার আজি প্রসাদবাণী চাই।"

এখনও যেন সকালের উপাসনার পরিবেশ, ধূপ-ধুনো ফুলের গন্ধ সবকিছুরই নাকে লেগে আছে। কানে লেগে আছে মনীষীর গাওয়া গানখানি। বড় ভাব আছে মেয়েটির গলাতে।

অনেকক্ষণই জানালা দিয়ে চেয়ে বসে থেকে শুরু করলেন শেষে।

বেয়াইমশাই,

আপনার চিঠি পেয়েছি কাল।

কী বলব জানি না, কেমন করে বলব, তাও না; তবে এমন সুন্দর চিঠি আমার জীবনে আমি কারো কাছ থেকে পাইনি। এ আমার মস্ত বড় প্রাপ্তি; পড়ে-পাওয়া ধন। একে সযতনে রাখার মতো সুরক্ষিত দেরাজ তো আমার নেই।

আপনি মুক্তি থেকে একদিন ফিরে আসবেনই, তার পর চলে যাবেন একসময় কলকাতায়। একথা ভাবলেই মন বড় খারাপ লাগে। তখন আপনার লেখা এই চিঠিগুলিই আমার একাকী, নির্জন আনন্দহীন একঘেয়ে জীবনের একমাত্র আনন্দ হয়ে রয়ে যাবে। গভীর রাতে, একা বসে বার বার করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়ব এই চিঠিগুলি।

বলতে পারেন? চলেই যদি যাবে তবে মানুষ এমন করে অন্যের মনের কাছে আসেই বা কেন? দুঃখ বাড়াতে?

আপনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন। মানুষ নিজেকে চিঠির মধ্যে যে-ভাবে প্রকাশ করতে পারে, তেমন বোধ হয় কোনো ভাবেই পারে না। মুখোমুখি সামনে বলা যায় না। কথার পিঠে কথা পড়ে যে ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে মাঠে মারা যায়; সেই সব কথা কেমন আপনা থেকেই কলমের মুখে ফুটে ওঠে ছবিরই মতো এক-এক করে। আমি নিজেও কি ভেবেছিলাম কখনও যে, আমি কাউকেই এমন দীর্ঘ লিখতে পারব? এখন মনে হয়, আমার নিজের কথার ভাঁড়ারও যেন অফুরান্। কত কী-ই যে বলার থাকে, পাতার পর পাতা দীর্ঘ হয়ে যায় চিঠি, খামের ওজন ভারী হতে থাকায় একসময় থামতেই হয়।

জীবনে, সবকিছুরই শুরুটা সোজা, থামটা বড় কঠিন। রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মাপের মানুষদের থামাথামির কথা নয়, আমি এমনি, সামান্য, সাধারণ আমার মতো মানুষদের থামাথামির কথাই বলছি।

আপনার এ-কথাও বোধ হয় ঠিক যে, একজন মানুষের চিঠি পড়ে, সেই মানুষটিকে, তার সমস্তটুকু ব্যক্তিত্বকে যত স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, নির্দ্বিধায় তেমন অন্য কোনো কিছুতেই প্রতিবিম্বিত করে। চিঠি লেখাও একধরণের লেখালেখি, সাহিত্য: তাই নয় কি? প্রত্যেক সাহিত্যকেই কি চমৎকার চিঠি লিখতে পারেন। তাইই? জানতে ইচ্ছে করে খুব।

আজ মনটা ভালো নেই। গিগির স্কুলের সহকর্মী ঝুনু হঠাৎই মারা গেলো। কুমারী মেয়ে। কতই বা বয়স! গিগির চেয়েও ছোটো হবে। বিয়েও ঠিক হয়ে গেছিলো। ছেলেটিও আমাদের জানা।

ক্লাস নিতে নিতেই চেয়ার থেকে পড়ে যায়। ম্যাসিভ হার্ট-অ্যাটাক। বিধাতার এ কিন্তু ভারী অন্যায়। আমার মতো নিষ্প্রয়োজনের মানুষকে ফেলে রেখে এতো সম্ভবনাময় একটি তরুণ জীবনকে ছিনিয়ে নেবার কি মানে হয় কোনো?

শ্রাদ্ধ হলো ব্রাহ্ম মতে । গানও হলো । কোথায় যেন পড়েছিলাম, শ্রাদ্ধ কথাটাও এসেছে শ্রদ্ধা থেকে । শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেরই আরেক নাম শ্রাদ্ধ । একজন উপাসনা করলেন ; ঝুনুরই কাকা । ভোপাল থেকে এসেছিলেন । রীতিমাফিক "আচার্য" কেউই ছিলেন না । তাইই বোধ হয় আন্তরিকতাতে কোনো ফাঁক ছিলো না । আমার মা যেমন করে নিজেই পুজো করতেন, কখনওই পুরুত ডাকতেন না, অনেকটা তেমনই আমরা ভাইবোনেরা ঘিরে বসতাম । কী ভালো যে লাগতো আমাদের বাড়ির পুজো, সত্যিই পুজো হয়ে উঠতো । লোকদেখানো অনুষ্ঠান নয় ।

ঝুনুর সম্বন্ধে ওর আত্মীয় বন্ধুরা অনেকে বললেন । তারপর শুধু একটি শরবৎ আর সন্দেশ। হিন্দুদের মতো দই আন লুচি কই এর বিচ্ছিরি সোরগোল নেই । যে মানুষ চলে যায়, হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ হলে তার কথা কেউই একবারও বলে না যে লদ্য করে আমার কষ্ট হয় । অবশ্য আমাদের জীবনাদর্শনও তো অন্য । আত্মার বিনাশ যখন নেই তাই আত্মা মুক্ত হয়ে গেলো বলেই বোধ হয় একধরণের আনন্দর পরিবেশ সৃষ্ট হয় সেখানে । আনন্দের কারণ হতে পারে ।

ওদের বিয়েটাও আমার খুব ভালো লাগে । আমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক, আমাদের উভয়ের মিলিত জীবন ঈশ্বরেরই হোক ।" এইরকম সোজাসুজি ব্যাপার । আমাদের মধ্যে সংস্কৃত যাঁরা শ্রাদ্ধর মন্ত্রে তফাৎ পর্যন্ত করতে পারেন না ।

হিন্দু ধর্মটারও খো-নলচে পালটানোর সময় এসেছে বোধ হয় নতুন করে । বিশেষ করে আচার-অনুষ্ঠানের । হিন্দুদের ধর্মের বাঁধন এই আড়ম্বর কারণেই বোধহয় শিথিল হয়ে আসছে । মসজিদে যান মুসলমানেরা নিয়মিত নামাজ পড়েন । রবিবার অনেক খ্রীষ্টানই গীর্জাতে যান । কিন্তু ছেলের পরীক্ষা বা ব্যবসার সংকট বা স্বামীর কঠিন এবং দুরারোগ্য অসুখ ছাড়া মন্দিরে যান এমন হিন্দুর সংখ্যা কি খুব বেশি আছে আজ ? আপনার কি মনে হয় না বেয়াইমশাই যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মর কোনোই ভূমিকা না থাকলে তার যথার্থ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই প্রশ্ন ওঠে । যা-কিছুই একে অন্যকে, একের সঙ্গে অসংখ্যকে বেঁধে রাখে ; তাইই তো ধর্ম । যা ধারণ করে রাহে তাইই ধর্ম ।

কিছু মনে করবেন না, অনেক আবোল তাবোল বকলাম । আমি এসব বিষয়ে বিশেষ জানিও না । তবু, এইসব প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা করব এমন মানুষও তো পাইনি আগে, তাইই আপনাকে এসব বলা । অনধিকারীর অপরাধ ক্ষমা করবেন ।

আজ এখানেই শেষ করি ।

রোজ একটি চিঠি লিখবেন ।

ইতি- বিনীতা নলিনী ।

চিঠিটা লিখে ফেলে এবং পোষ্ট করে নলিনী একটু বিড়ম্বনাই বোধ করলেন । চিঠির মধ্যে দিয়ে ওঁর আর বেয়াইএর যে সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে এই সব তত্ত্বকথা ও ধর্মীয় কচকচি না অনলেই ভালো হতো । তবু এসে পড়লো প্রসঙ্গত ।

শুভাশিস হয়তো বিরক্তই হবেন নলিনীর এই অনধিকার চর্চাতে । ওঁদের দুজনের সুন্দর সব চিঠির হাওয়ায় যেন হঠাৎই ঘুর্ণী উঠলো । এসব না লিখলেই ভালো করতেন ।

শুভাশিসের চিঠি এলো আবার চার দিন পর । নলিনীর শেষ চিঠির উত্তর ।

নলিনী বেয়ান, কল্যাণীয়াসু,

আরোও ক'দিন এখানে থেকেই যাওয়া মনস্থ করেছি । কলকাতা ফিরেই তো আবার সেই একার জীবন, একঘেয়েমি, খবরের কাগজ, টিভি ।

খবরের কাগজ আর টিভি-র মতো শত্রু মানুষের আর নেই । ভবিষ্যতের ইতিহাস একথা নিশ্চয়ই লিখবে । মানুষকে তার প্রধান উদ্দেশ্য থেকে মেডিয়ার এই দুই বাহন যে ভাবে পথভ্রষ্ট করেছে তার তুলনা নেই । মানুষ ভুলেই গেছে কি ছিলো তার প্রকৃত অন্বিষ্ট, কেন এসেছিলো সে এই পৃথিবীতে, তার সঙ্গে বুনো শুয়োরের তফাৎ ঠিক কোথায় এবং কতখানি, তাও সে ভুলে গেছে অনায়াসে ।

আমি বলেছি বেয়ান, যে এই বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব সভ্যতা, এই প্রচার - লোভী মানসিকতা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে নিউক্লিয়ার বোমার চেয়ে অনেকই বেশি বিধ্বংসী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে । নিউক্লিয়ার বোমাতে শরীরই দীর্ণ হয়, আর এইসব প্রচার-মাধ্যম মানুষের মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় । অমানুষ করে তোলে । এইসব মেডিয়া মানুষকে অকাজে নিবদ্ধ রেখে তার আসল যা কাজ তাইই করা যাতে না হয়ে ওঠে, তারই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ।

"ধর্ম" ব্যাপারে এই অধার্মিক আপনি যে সব প্রশ্ন শুধিয়েছেন তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে মুশকিল। আমি নিজে কোনো ধর্মই মানি না। বিএ পাশ করার পর, ব্যারিস্টার পড়তে যাওয়ার আগে ইংরেজ সরকারের একটি সংস্থাতে চাকুরীর আবেদন করেছিলাম, নেহাৎই শখেরই বশে। দরখাস্তের একটি কলাম ছিলো : "রিলিজন"। আমি লিখেছিলাম : হিন্দু বাই বার্থ। বাট আই ডু নট কনফার্ম টু এনি পার্টিকুলার রিলিজন। ম্যানকাইন্ড ইজ মাই রিলিজন।

এই নিয়ে লালমুখো ইংরেজরা আধঘণ্টা জেরাও করিয়েছিলেন আমাকে। ইণ্টারভ্যুর সময়ে। ওরা ভেবেছিলেন যে, আমার মতবল সুবিধের নয়। অথবা আমি নিশ্চয় কম্যুনিস্ট। কম্যুনিস্ট হওয়াটা সেই সময়ে মস্ত অপরাধ বলেই গণ্য হতো।

একথা ঠিকই যে হিন্দু ধর্মের প্রকাশ, মানে প্রাত্যহিক আচার ইত্যাদি, বিশেষ করে শিক্ষিতদের মধ্যে কমে এসে প্রায় লোপই পেতে বসেছে। আধুনিক হিন্দুরা ধর্ম তো মানেনই না, ঈশ্বরও মানেন না।

আমি ধর্ম মানি না কিন্তু ঈশ্বর মানি। এইটিই আমার ঈশ্বর।

আমার কথা এখানে অবান্তর। আমি আধুনিক একজন বিখ্যাত "আধুনিক" মানুষকে বলতে শুনেছি যে যাঁরা ধর্ম মানেন তাঁরা ইডিয়ট এবং যাঁরা ঈশ্বর মানেন তাঁরা পাগল।

এক জনের বিশ্বাস একেকরকম। ঈশ্বরদ বোধ সব মানুষের মধ্যে থাকবে একথা আশা করাও ভুল। অনেক জন্ম গরু-গাধা-ব্যাঙ-তেলেপোকা হয়ে জন্মানোর পর এবং হাজার হাজার বার মনুষ্যজন্মর পরই হয়তো ঈশ্বর-বোধ ভিতরে জন্মায়। একধরণের অতি সপ্রতিভ ঔদ্ধত্যেই আজকাল আধুনিকতা টোকা খেলেই খসে পড়বে, বেড়িয়ে পড়বে তাদের আসল রূপ। তাইই এদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই আমার। আমার, মানে আমার নয়; হিন্দুদের।

আমাকে এক সাহেব, খুব সম্ভব অস্ট্রিয়ান ঃ বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে বলেছিলেন, "ট্য হ্যাভ টু আ হিন্দু টু ফাইন্ড হিন্দুইজম ইন হিম।" বাইরে থেকে এই ধর্মের গভীরতা বোঝা যায় না। ফল্গু নদীরই মতো। বালিরেখার তলায় তলায় চলে। এর বাহ্যিক প্রকাশের ঘনঘটা কম বলে ভুলেও মনে করবেন না যে এর জোর কিছু কম। বাহ্যিক দৌর্বল্যই ওর সবচেয়ে বড় বল।

জানি না এসবের সত্য মিথ্যে। তাছাড়া ভদ্রলোক হিসেবে ধর্ম-টর্ম নিয়ে আলোচনা আমি করতে চাই না। ধর্মর বাঁধন সাধারণ মানুষদের জন্যে। যারা প্রকৃত শিক্ষিত, মানে নিজের মনের মধ্যে ঔদার্যর বোধকে যাার অর্জন করেছে জীবনে, তারা ঈশ্বর-বোধ নিয়েই খুশি। এবং তাইই থাকা উচিত।

মসজিদ বা মন্দির বা গীর্জা সাধারণ মানসিকতার মানুষদেরই জন্যে। যারা নিরাকার ঈশ্বরের কথা ভাবতেই পারে না, শুধু তাদেরই জন্যে। যাদের মানসিকতা এক বিশেষ উচ্চতা পেয়ে গেছে তাদের কাছে এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সঙ্গে ধর্মর কোনোই তফাৎ নেই। "অল রোডস্ লিড টু রোম"। ঈশ্বর; তিনি তো একই। কেউ তাকে কৃষ্ণ বা কালী বলেন, কেউ বলেন ক্রাইস্ট, কেউ বা মহম্মদ।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হিন্দুদের প্রায় সমস্ত মন্দিরেরই অবস্থান হয় গহন অরণ্য, নয় সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ, নয়তো সমুদ্রের তীরে। আমার মনে হয় এর পেছনে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সাধারণ মানসিকতার মানুষ, যার পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করাই অসম্ভব; তাকে প্রথমে এমনই এক প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও বিরাটত্বর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সে যে কিছুই নয় কেউই নয়, সে অতি দীন, অতি সামান্য এই বিনয়ের এবং শ্রদ্ধার ভাবটি তার মনে জাগরুক হচ্ছে। সেই অবস্থাতে সে অন্ধকার মন্দিরে ঢুকে কোনো বিগ্রহকেই ঈশ্বর প্রতিভূ মনে করে ভক্তিভরে পুজো করছে। আসলে তার মনে আগেই দীন ভাব এসেছে, কিন্তু সাকার বিগ্রহকে পেয়ে সে তারই সামনে মাথা নোয়াচ্ছে। আসলে কিন্তু অতলান্ত আদিগন্তে সমুদ্রের, গভীর গম্ভীর দুর্গম অরণ্যের, অথবা নগাধিরাজ হিমালয়ের পায়ের কাছেই তার পুজো। কিন্তু সে পুজোর যোগ্য সে তখনও হয়ে উঠতে পারেনি বলেই তাকে মন্দিরের সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে গিয়ে পাথরের অন্ধকার, দমবন্ধ-ঘরে তার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে। হাত দিয়ে ছুঁতে হচ্ছে।

আমার তো মনে হয় ধর্ম ব্যাপারটি বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত এই পৃথিবী থেকে। তাহলেই এক ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীর বিরোধের প্রশ্নই আর থাকবে না। যে মানুষের সেবা করে, সেইই ঈশ্বরের সেবা করে। বিবেকানন্দ যে অর্থে ধর্মপ্রচারক ছিলেন তাইই হচ্ছে আসল ধার্মিকের ধর্ম। সেই ধর্ম কখনওই কোনো বিশেষ ধর্মের প্রচার চায়নি, মানুষের যা প্রকৃত ও মূল

তাই বিকীরনের প্রয়াস করেছিল মাত্র । যে-ধর্মের মানুষেরা অঙ্কতুর সাধনা করেন, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে অবিশ্বাসী মনে করেন, তাঁদের ঈশ্বরবোধ আসতে অনেকেই দেরী হবে । ধর্ম, জাতীয়তাবাদ নয়, একতাবদ্ধ গুণ্ডামির যুক্তি নয় ; ধর্ম দলও নয়, ধর্ম যদি প্রকৃতই ধর্ম হয়ে উঠতে চায় তবে তাকে মানুষের ধর্মই হয়ে উঠতে হবে । অন্ধত্ব সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সমানভবে দূষণীয় । হিন্দুদের মধ্যে একদিন এবং এখনও জাত-পাত যদি না থাকতো তবে অত্যাচরিত অপমানিত হয়ে হয়ে অনেকেই হিন্দুরা মুসলমান হয়ে গিয়ে তাদের আত্মসম্মান বাঁচাতেন না । যে-কোনো ধর্মেই যদি মানুষে মানুষে বিভেদ করা হয় তাহলে সে আর ধর্ম থাকে না ।

হিন্দু ধর্মের মানুষদের গোঁড়মি এবং অশিক্ষা কম নেই, নইলে আজও কি বিহারে আর উত্তর প্রদেশের হরিজনদের খুন করা হয় ? যারা আজকের দিনেও এমন করতে পারেন তারা তো অমানুষই । তাদের কোনো ধর্মেরই যোগ্যতা নেই, ঈশ্বর-বোধ তা অনেকই বড় ব্যাপার ।

এসব প্রসঙ্গ থাকই না হয় । অযোগ্য জনের পক্ষে এসব নিয়ে আলোচনাও মানায় না । সাধারণ-জ্ঞানে যতটুকু জানি তাইই আপনাকে বললাম । এ ব্যাপারে পড়াশোনা তো কিছুই নেই।

আজ খুব ভোরে উঠে হাঁটতে গেছিলাম জঙ্গলে । বেশ কিছুক্ষণ আগে ফিরে, চান করে, ধীরে-সুস্থে প্রাতরাশ খেয়ে ঘরের লাগোয়া বারান্দার রোদে চেয়ার-টেবল পেতে বসে আপনাকে চিঠি লিখছি ।

কোনো কোনোদিন এমন হয় যে, সকাল থেকেই ভারী ভালো লাগে । শিশু দিনটি যেমনই এগোতে থাকে তার সন্ধ্যেবেলার পরিণতির দিকে, তেমনই সেই ভালোলাগা যেন বাড়তেই থাকে । এবং আশ্চর্য ! দিনান্তবেলাতেই যেন তা পূর্ণতা পায় ।

অবাক হয়ে ভাবি, আমাদের জীবনটাও যদি এমনই হতো । জীবনে কেন উল্টোটাই ঘটে ? সকালের সব ভালো লাগা ক্রমশই তিক্ততাতে ভরে উঠে দিনশেষের মুহূর্তটিকে গ্লানিতে, অনুশোচনাতে হতাশাতেই ভরিয়ে তোলে কেন ?

আমি যদি কাজ না ছাড়তাম বেয়ান, যদি থামতে না জানতাম, তবে এমন করে এত সব কথা ভাবতেও পর্যন্ত পারতাম না । থেমে যাওয়া, একটা সময়ের পর খুবই দরকার । জীবনের যে টাকা-পয়সা, খাওয়া-পরা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছাড়াও প্রত্যেক মানুষের, বিশেষ করে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছনো মানুষের ; একটি অন্য ভূমিকা আছে তা কাজ না-ছাড়লে বোঝাই যায় না ।

মুক্তির সাফারি লজটি থেকে বেরিয়েই একটি ব্রিজ আছে বানজার নদীর উপরে । নতুন ব্রীজ । তার পেছনেই পুরোনো কজওয়েটি, এখন ভেঙ্গে গেছে । সকালে যখন বেরিয়েছিলাম বানজারের সাদা বালি তখনও কুয়াশাতে ভেজা ছিলো । জলের আর জলভেজা-বালির রঙ তখন যেন প্রায় একই রকম দেখাচ্ছিল । প্রায় বেলা বাড়লেই আলাদা হয়ে যাবে এরা । শীতের রাতে তারা যেন মিলিত হয়েছিলো একে অন্যর সঙ্গে পরম আশ্লেষে !

এখন প্রকৃতির মধ্যেই এলেই সমাহিত বোধ করি । অথচ বনজঙ্গল সম্বন্ধে আমার কোনো আকর্ষণই ছিলো না । চিরটাজীবন কাজ করে, বড় বড় শহরের বড় বড় হোটেলে থেকেই কাটিয়ে দিয়েছি । বনজঙ্গল এবং প্রকৃতির যে কতবড় ভূমিকা আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে তা জানতাম পর্যন্ত না ।

আমার এক ক্ষ্যাপাটে বন্ধু আছে । নাম হিতেন । সে বিয়ে-থা করেনি । প্রথম যৌবন থেকেই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় । পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকে সে একটি ডাইরী লিখছে জঙ্গলের । অনেক প্রকাশকের দোরে দোরে ঘুরেওছে আজ অবধি । নিজে স্কেচও করেছে অনেক । অবশ্য শুধুই ফাউন্টেন-পেন দিয়ে । আঁকিয়ে সে বড় নিশ্চয় নয়, কিন্তু জঙ্গলের মূল ব্যাপারটি তার আঁকি-বুঁকিতে যেমন করে এসেছে তা কোনো নামী আর্টিস্টের তুলিতেও আসতো না । ওর দেখার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই, ভানও নেই । যে বিষয়ে সে জানে শুধু সেই বিষয়েই সীমিত রেখেছে নিজেকে । সেই জন্যই ওর ডাইরী এবং স্কেচকে বিশ্বাস করতে, ভালো লাগাতে, অসুবিধা হয় না একটুও ।

জঙ্গলের প্রেমে, ওই আমাকে দীক্ষা দেয় ।

তারপরেই মনে হয়েছিলো, আমাদের শাস্ত্রেই যদি বলে থাকে যে, "পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ" তবে বনের কোনো ভূমিকা হয়তো মানুষের জীবনে নিশ্চয়ই আছে । হিতেনের সঙ্গেই প্রথমে কয়েকবার আসতে আসতেই নেশা ধরে গেলো । ওর চোখ দিয়ে না দেখলে তা হতো কী

না জানি না। জঙ্গলে তো যায় অনেকেই কিন্তু হিতেনের দেখার চোখই আলাদা। অবাক হয়ে ভাবতাম ওকে দেখে যে, চোখ তো সব মানুষেরই আছে, কিন্তু দেখার চোখ থাকে ক'জনের ? বনে আসতে আসতেই বুঝতে পারলাম পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ কথাটার তাৎপর্য।

কী যে ভালো লাগলো আজ ! পিচ রাস্তা ছেড়ে কাঁচা মাটির যে পথটি জঙ্গলের গভীরে চলে গেছে কানহা এবং কিসলির দিকে, তা ধরেই হাঁটছিলাম। যদিও পায়ে হেঁটে এ বনে ঢোকাই বারণ। বাঘেদের রাজ্য এ। পুবের আকাশ সবে লাল হচ্ছিল। একদল বারাশিঙা পথ পেড়িয়ে গেলো দৌড়ে। আমার সামনে দিয়ে। ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে শিশির ভেজা মাঠে। মেয়ে ময়ূরগুলিকে দেখে অবাক লাগে। ময়ূর বলতে আমরা শুধু যেন পুরুষদেরই বোঝাই। প্রাণী জগতের সব পুরুষই সুন্দর। মানুষদের বেলাতেই নারী।

বনের গভীরে থেকে কতরকম পাখিই যে ডাকছিল। মনে হচ্ছিল যেন সুরের এক মস্ত কারখানারই কাজের ঘণ্টা বাজলো এক্ষুনি।

এই কার্তিকের বনের প্রথম সকালের ভিজে থম্-ধরা স্তব্ধতার মধ্যেও যে কতো সুরের আরোহণ-অবরোহণ তা যার কান আছে সেইই বুঝতে পারে। ভৈরবী ঠাটের কালিংড়া আর মাড়োয়া ঠাটের সোহিনীর সুর যেন আমার সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে ছুটে বেড়াচ্ছে। কী আশ্চর্য অনুভূতি ! এই নীরব সুর যে একবার শুনতে পেয়েছে তার আর কোনো দুঃখই বোধ হয় থাকার কথা নয়। কেন জানি না বেয়ান, কাল রাতে শোওয়ার সময়ে আপনার চিঠিটা যখন পড়েছিলাম তখন মনে হলো আমি জীবনে একা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমি একা নই। শোওয়ার সময়ে যে ভালোলাগা নিয়ে শুয়েছিলাম সকালেও সেই ভালোলাগাই আমাকে ছেয়েছিলো। এখনও আছে।

আজ বনের মধ্যে হাঁটতে নিজেকে বারবার শুধোলাম, এই ভালোলাগার মানে কি ? কোনোই উত্তর দিলো না মন। আপনি কি বলতে পারেন বেয়ান ? আমার চিঠি পড়েও কি আপনার এমনই ভালো লাগে?

খুব জানতে ইচ্ছে করে।

রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন লিখেছিলেন, ঠিক কোথায় তা মনে পড়ছে না ; লিখেছিলেন মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দিলে বিশুপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই ; এই জন্যে বিশুপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ"।

জানি না, হয়তো তাইই। সত্যিই বিশুপ্রকৃতির মধ্যে কোনোই জটিলতা নেই। আমার ক্ষ্যাপা বন্ধু হিতেন তো বলে প্রকৃতির মধ্যেই প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত মুক্তি নিহিত আছে। হয়তো ক্ষ্যাপা ঠিকই বলে।

কিন্তু বেয়ান, প্রকৃতির এই সকালবেলার সৌন্দর্য ও সুরের মধ্যে এক গভীর বিষণ্ণতাও আছে। সে বিষণ্ণতার কথা ব্যাখ্যা করে বলি তেমন ভাষা তো আমার নেই।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশ পঁচিশ বছরে রবীন্দ্রনাথকে আবারও নতুন করে বেশ ভালো করে পড়ে লাভ হলো অনেকেই। যে ভাবই নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না সেই ভাবই রবীন্দ্রনাথের কলমে সহজেই প্রকাশ করা যায়। এই কারণেই বোধহয় রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের কবিদের এতো অসুবিধা।

ছেলেবেলায় আমারও একটু কাব্য রোগ ছিলো। কিন্তু যাইই লিখতে যাই মনের যে ভাবই প্রকাশ করতে যাই, দেখি রবীন্দ্রনাথ আগেই লিখে গেছেন। ভাগ্যিস সময়তো কবি হওয়ার উচ্চাশা ত্যাগ করেছিলাম। নইলে, অন্য কবিদের, প্রাচীন এবং আধুনিক কবিতা পড়ে আজ এতো আনন্দ পেতে পারতাম না। ইদানিং এই দেশে গুণীর সংখ্যা গুণগ্রাহীদের চেয়ে অনেকই বেশী হয়ে গেছে। উল্টোটা হলেই সুখের হতো। আমি কিন্তু গুণগ্রাহী হয়েই খুশি আছি।

আপনি গান করেন, আমি শুনি। কেন জানি না, ভালো গান শুনলে, দিনান্তে কোনো সুন্দর নদীর বাঁকে এসে দাঁড়ালে, গভীর বনের মধ্যে সন্ধে নামলে আমার বড় কান্না পায়। আপনারও কি অমন হয় বেয়ান ?

"নদী কালস্রোতে, নির্জন পর্বত শিখর থেকে যে সঙ্গীতকে বহন করে সমুদ্রের দিকে চলেছে সেই সুরে কান্না রয়েছে ; আমি যে নির্জন থেকে নির্জনের দিকে চলেছি সেই নির্জনের সুর গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে ঘোষণা করেছি, কারো সময় হলো না সেই আহ্বান শুনবার। আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল-- দরজা রুদ্ধ -- কেউ শুনল না।

এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম, সেখানে কি কেবল কাজ ! কাজ ! কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল ! কেবল এই কলহ মাৎসর্য বিরোধ ! সেখানে এরাই কি সকলের চেয়ে প্রধান। এই সুরের কি চন্দ্র সূর্য সুর মেলাচ্ছে ! এই সুরেই কি সুর ধরিয়েছিলেন নেদিন জননী প্রথমে শিশুকে মুখচুম্বন করলেন ! এত বড়ো আকাশ, আর এমন নির্মল নীলিমা ! একে মানব না ? পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না।"

বেয়ান, এই সব কথা, আমাদের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা ; আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে না ; পড়েনি। পড়লেও হয়তো ওরা হাসে আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস বা প্রকৃতি-প্রেম নিয়ে। ওরা জানে না , যেমন আমরাও আমাদের যৌবনের জানতাম না যে, কোনো মানুষই সর্বজ্ঞ নয়ই ! যৌবনে তো নয়ই ! জ্ঞানের পলেস্তারা পুরু হতে থাকে জানে জীবনের পথে চলতে চলতেই কিন্তু মৃত্যুর মুহূর্তে পৌঁছেও আসলে জানা যায় অতি সামান্যই। একটা ছোট্ট জীবনে কতটুকুই বা জানা যায়, অনুভব করা যায়, এই বিপুলা পৃথিবীর ক'জায়গাতেই বা যাওয়া যায় ?

ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনোই অনুযোগ নেই। ওদের বয়সে আমরাও ওদেরই মতো ছিলাম। কাউকেই কিছু শেখাতে না যাওয়াই ভালো, নিজের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাতে যে যা শিখলো, সেইটাই আসল শিক্ষা। জলে না নামলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, জীবনে অবগাহন না করলেও জীবনকে জানা যায় না। এর কোনোই বিকল্প নেই।

এখন সকাল দশটা বাজে। আপনি এখন কি রান্নাঘরের রোদ্দাতে রোদে পিঠ দিয়ে, আপনার ছোটো শালটি আলতো করে পিঠে জড়িয়ে বসে, বড় শান্তিতে চা খাচ্ছেন ? আপনার সেই হালকা বেগুনী রঙা বড় কাপটিতে করে ?

দেখতে পাচ্ছি যেন, বাটুমা রান্নঘরে কিছু করছে। বাগান থেকে পাখি ডাকছে। শীত এসে গেলো বেয়ান। "এলো যে শীতের বেলা বরষ-পর/ ..... বাইরে কাজের পালা হইবে সারা আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা -- আসন আপন হাতে পেতে রেখো/ আঙিনাতে / যে সাথী আসিবে রাতে তাহারি তরে।"

বেশ হতো না বেয়ান ! এই জীবনের দিনশেষের শীতের বেলায় যদি কোনো সাথীর জন্য আসন পেতে বসে থাকা যতো ! না ?

হাঁটুর বাত কেমন আছে, প্রেসার ? ডাই-টাইট ট্যাবলেটটা খেয়ে যাবেন। সেন্‌সিটাল বলে যে টুথ-পেস্টটা দিয়ে এসেছিলাম তাই দিয়ে দাঁত মাজবেন কিন্তু। মাড়ি খুব ভালো থাকবে।

ভালো থাকবেন বেয়ান।

এই চিঠিটা বড়ই এলোমেলো হয়ে গেলো। আজ সকালের বনাচারণ আমার ভেতরটাকে বড় এলোমেলো করে দিয়েছে। বারান্দার সামনে কিছুক্ষণ থেকেই একটা হাওয়া মর্মরধ্বনি তুলে সাবধানী হরিণীর মতো নদীর ঐ পারের জঙ্গলে জঙ্গলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে নদীপারে এসে এক একবার থমকে দাঁড়াচ্ছে। পরক্ষণেই আবার ফিরে আসছে।

দিনের এই সময়টাতে প্রকৃতি বড় মন্থর। মনে হচ্ছে সকালের এই সময়টুকু যেন অনন্তকাল ধরেই থেমে থাকবে। কোনোই তাড়া নেই। শুকানো পাতা গড়িয়ে যাচ্ছে হাওয়ায় পাথরের উপরে উপরে মন্দাক্রান্তা ছন্দে। বিলম্বিত এক তোলে কোনো গায়িকা যেন জৌনপুরীতে গান ধরেছেন। "মুরলী বাজে মোহন ধুন শুনত/ সব গোপীয়া রিঝত/

অন্তরালে এসে সে গাইছে " চঞ্চল সৈঁয়া দেখে/ নাচত প্যারী রাধা/ সব কাম বিসরত।"

কোমল "নি" যেন বুকের সব আনন্দর আসন্ন শীতের এই বিধূর বনে। সবকিছুই ঘটছে এখন শুধুই বিলম্বিত একতালে বাঁধা হয়েছে আজ সকালের জৌনপুরী। নরম পা ফেলেছে শুদ্ধ বা কোমল পর্দাতে, থমকে দাঁড়াচ্ছে শ্রুতিতে, সুরে, আবারও চমকে চলছে। উছলে উঠছে জলের মধ্যে থেকে পাহাড়ি মাছ। সেও যেন জেনে গেছে কী রাগে, কী তালে আজ সকালের সুর বাঁধা হয়েছে। সমস্ত প্রকৃতিতে, আমার মনকে কোন্ অদৃশ্য কন্‌ডাক্টর যেন তাঁর নীরব নির্দেশে এক ঐশী ঐকতানে বেঁধে দিয়েছেন।

আর বেয়ান ! কী আশ্চর্য সুখানুভূতি। কী গভীর শান্তি। কী ভালোবাসা।

আপনি যদি এই মুহূর্তে পাশে থাকতেন তাহলে কী ভালোই যে হতো !

ভালো থাকবেন। ইতি - আপনারই শুভাশিস।

॥ ৭ ॥

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর নলিনী পেছনের বারান্দাতে বসেছিলেন কোলের উপর ফিকে-হলুদ-রঙা উলের লাছি নিয়ে। সামনের তেপায়াতে পানের বাটা, জর্দার কৌটা সব রাখা ছিলো। রানী দুর্গাবতী কলেজের দিক থেকে যে পায়ে-চলা পথটা এসে নর্থ সিভিল লাইনস-এর দিকে চলে গেছে তা দিয়ে একজন মোমফুলিওয়ালা মোমফুলি হেঁকে যাচ্ছে। টিয়ার ঝাঁপাঝাঁপি করছিলো বাগানে।

নাতি টুটুর জন্যে গত পূজের সময়ে একটি সোয়েটার বানিয়েছিলেন। প্রতি বছর হলে ভৃগুর জন্যেও একটি করে বানিয়ে দেন। এই রঙটা পছন্দ করে এনেছিলো ওই ভৃগুর জন্যে। কেন যে তা জানেন না নলিনী। ভৃগুকে এই রঙটা একবারেই মানাবে না। উনি মা, উনি ভালো করেই জানেন ছেলেকে কী মানাবে আর মানাবে না।

গিগির হয়তো শখ হয়েছিলো অন্য অনেক মেয়েরা, তাদের সুন্দর লম্বা-চওড়া স্বামীদের যেমন পরায়, তেমন সেও তার স্বামীকে হলুদ কিংবা ম্যাজেন্টা কিংবা আকাশী-নীল ফুল-স্লীভস্ সোয়েটার পরাবে। পরাবে মানে, ওর শুধু উল কেনাটারই দায়িত্ব। উল কিনে এনে ফেলে দিলেই নলিনীহি বাকিটা করে নেবেন। এর ওর বাড়ি থেকে লেটেস্ট ডিজাইনের সব নতুন নতুন বই জোগাড় করে একেবারে চমৎকারতম সোয়েটারটি বানিয়ে দেবেন ছেলের জন্যে। অবশ্য ছেলের বউ-এর রোজগার করা টাকায় কেনা উল দিয়েই।

কিন্তু এই সোয়েটারটি তিনি ভৃগুর জন্যে বানাচ্ছেন না। টুটুর জন্যেও নয়। জীবনে, ভালবেসে, আদর করে কাউকে কিছু দেওয়ার মতো ভাগ্য নলিনীর ছিলো না। যাকে কিছু দিয়ে, নিজেকেই ধন্য করা যায় এমন কোনো মানুষও তো তাঁর জীবনে আসেননি কেউ। তাই গিগিকে না জানিয়েই গিগির পয়সায় কেনা উলে তিনি গত চারদিন হলো ক্রমান্বয়ে রাত-দিনের সমস্ত উদবৃত্ত সময়টুকু এই ফিকে-হলুদ স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছেন।

হতে তো ? মানুষটার কাঁধ আর পিঠের মাপটা একবার নিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সময় পেলেন কই ? তবু কল্পনাতেই নিয়েছেন। কল্পনাতে শুভাশিসকে একটু ছুঁয়েই ভালোলাগায় শরীর কেঁপে উঠেছে ওঁর।

গিগি যখন জানবে এবং ভৃগুও, তখন কী বলবে কে জানে ? বললে, বলবে। তবে উলের দামটা নলিনী গিগিকে শোধ করে দেবেনই। একমাসে না হলেও দুতিন মাসে। পরের টাকাতে এইসব করতে কোনো মেয়েরই ভালো লাগে না। তবু, এই মুহূর্তে এই দেশের নিরান্নব্বই ভাগ মেয়েই, বিশেষ করে বিবাহিত মেয়ে, স্বামীর টাকাতেই তাদের প্রিয়জনদের এবং হয়তো প্রেমিকাদেরও উপহার কিনে দিচ্ছে। টাকাতেই তাদের প্রিয়জনদের এবং হয়তো প্রেমিকাদেরও উপহার কিনে দিচ্ছে। নলিনীরই মতো। আত্মসম্মান যে তাদের নেই তা নয়। যথেষ্টই আছে। কিন্তু তবুও তারা নিরুপায়। প্রত্যেক মেয়েরই নিজস্ব কিছু রোজগার থাকা উচিত। নিজের কয়েদী জীবন প্রায় শেষ করে এসে এখন রাত নামার সময়ে এই কথাটা বিশেষ করেই বোঝেন উনি।

গিগির মতো অনেক আধুনিক শিক্ষিত মেয়েই খাওয়া-পরার কষ্ট না থাকলেও বোধ হয় শুধু এই কারণের জন্যেই রোজগার করে। কিন্তু ওদের দেখলে ওর অবাকও লাগে না যে তা নয়। গিগি নাকি ওর স্কুলে সেলাইয়ে এবং রান্নার পরীক্ষাতে বরাবর ফার্স্ট হতো। ওর সেলাই-এর নমুনা গিগির মা দেখিয়েছিলেন। বিয়ের আগে যখন গিগিকে দেখতে গেছিলেন নলিনীরা।

পুতুলের সোয়েটার, কল্পিত অতিথির আসন, ভাবী শ্বশুরমশায় অথবা বেচারী বাবার অজ্ঞাতসারেই বাবার জন্যে ফুল-মোজা, মাথার টুপী অথবা বেচারী ইত্যাদি ইত্যাদি দেখেছিলেন অনেকেই। চমৎকার!

অথচ বিয়ের পরে গিগিকে একদিনের জন্যেও একটু সেলাই অথবা একটি পদও রান্না করতে দেখেননি। নলিনী যখন থাকবেন না তখন অনেকেই কষ্ট করতে হবে বলেই বোধা শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছে গায় বউমা তাঁর। এত জানে, অথচ কেন যে করে না তা ভেবেই পান না নলিনী। ওদের স্কুল কলেজের লেখাপড়া ওদের যা শিখিয়েছিলো সেই শিক্ষায় আর যে-জীবন ওরা যাপন করছে সেই জীবনের মধ্যে কোনোই সাযুজ্য নেই। তবে হ্যাঁ। একটা জিনিস হয়েছে এই ইংরিজি-মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, তা হলো, নিজেদের ভাসিয়ে-দিতে শেখা। ওদের কাছে, ওদের সময়ে ; ওদের জীবনে ওরা নিজেরাই যে সব, ওদের সুখ-সুবিধা, ওদের পছন্দ-অপছন্দ ওদের জীবনের চারিদিকের পরিমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা নলিনী খুবই বুঝতে পারেন। এবং

বুঝতে পেরে খুব খুশিও হন। নলিনীদের সময়ে নিজেদের এমন করে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা, নিজেদের জন্যে নিজেদের শর্তে বাঁচার কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিলো না।

ওঁরা ছিলেন গাছেরই মতো। বিয়ের পরদিন থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন উচ্চতাতে বেড়েছেন, নিশ্চয়ই প্রস্থেও ; পাতার রঙেও গাছেরা যেমন করে বাড়ে। শাখা-প্রশাখার সেই তারতম্যে ধূসর রঙ লেগেছে আর কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও নড়াচড়া করতে পারেন নি।

ওঁরা ছিলেন গাছ। আর গিগিরা পাখি। এ গাছে ও গাছে উড়ে বেড়ানোর আরেক নামই এখন জীবন। ওদের ডানা আছে। নলিনীদের পাটুকু পর্যন্ত ছিলো না।

ভাবতে ভাবতে গিগি এবং গিগিদের প্রজন্মের প্রতি মাতৃসুলভ স্নেহে এবং প্রশ্রয়ে, তাঁর মন ভরে উঠলো। মুখের কোণে স্মিত হাসি ফুটে উঠলো।

বাটুমা বাগানে শুকোতে-দেওয়তা কাপড় তুলছিলো। বললো, কী হলো মা ! আপনি হাসছেন যে।

চমকে উঠে নলিনী বললেন, হাসছি ? কই ? না তো !

না তো কি ? দেখলাম আমি।

তাহলে হবে। স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলাম বোধহয়।

এই দুপুর বেলায় সোয়েটার বুনতে বুনতে স্বপ্ন ?

বাটুমা বিপদগ্রস্থর মতো চেয়ে থাকলো একটুক্ষণ নলিনীর মুখে।

তারপর বললো, এই খেয়েছে। সত্যনাশ হয়ে গেছে।

কি ?

বিরক্তমুখে নলিনী সেলাই থেকে মুখ তুলে শুধোলেন।

ওঁর বিকেলের ফ্রেমের বহু পুরোনো চশমাটি নাকের ডগাতে নেমে এলো।

ঔৎসুক্য কুঁচকে উঠলো তীক্ষ্ণ নাক।

বাটুমাকে বললেন, কী রে ? হলোটা কি ?

দাদাবাবুর শোয়েটারটা আপনি এত্ত বড় করে দিলেন ? গায়ে যে ঢলঢল্ করবে। আলখেল্লার মতো। সত্যনাশ করে দিলেন।

নলিনী বাটুমার কথার উত্তর দিলেন না। ভাবলেন, তামিলনাড়ুর লোক যখন হিন্দি শেখে তখন উদ্বেগের নিরসন না করেই বললেন, ক'টা বাজে রে ?

কেন ?

সময়মতো চা দিস।

বাটুমা, নলিনীর সোয়েটার-সংক্রান্ত নীরবতায় খুবই চিন্তিত হলো। কোনো ব্যাপার আছে।

মুখে বললো, দেবো চা। একেবারে ঘড়ির দিকে কাঁটায়।

বলেই, নিজের হাতঘড়িরটা আরেকবার দেখলো। বললো, এখনও ষোলো মিনিট, সাইত্রিশ সেকেন্ড বাকি আছে।

কিসের ?

অন্যমনস্ক নলিনী বিস্ময় প্রকাশ করলেন মিনিট সেকেন্ডের এমন চুলচেরা বিভাজনে।

চারটে বাজতে।

বাটুমা বললো। ঝকমকে মুখে।

ও।

নলিনী বললেন।

আবারও স্মিত হাসির আভাস ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

নলিনী ভাবছিলেন শুভাশিসেরই কথা। আজকাল নাকি নতুন একরকম চশমার কাঁচ বেরিয়েছে। আলোর তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে যার রঙ বদলায়। ঘরের ভিতরে সাদা, বাইরে লালচে অথবা কালচে। বানিয়ে দেবেন বলছিলেন শুভাশিস ঐরকমই চশমা ওঁকে।

ওঁর দশ বছরের পুরোনো চশমাটা যে খারাপ হয়ে গেছে তা ভৃগু বা গিগি কখনও লক্ষ্য করেনি। অথচ রোজই উল্টোদিকের চেয়ারে খাওয়ার টেবলে বসে খায় ওরা। সবসময়ই কাছ থেকে দেখে। চোখ থাকা আর দেখা বোধ হয় সত্যিই সমার্থক নয়। শুভাশিস ঠিকই লিখেছিলেন। চোখে তো কত কিছুই পড়ে। তার কতটুকুই বা সত্যি সত্যি দেখে মানুষ।

কত কীই যে করলেন বলে কথা দিয়ে গেলেন এই ক'টি দিনের মধ্যেই মানুষটি ! এত কিছুর যে অভাব ছিলো নলিনীর তা উনি জানতেনই না। এত তীক্ষ্ণ অথচ দরদের চোখে তাকে আজ অবধি কেউই তো দেখলো না !

মানুষটি কী যে সত্যিই চান নলিনীর কাছে তাও সঠিক বুঝে পর্যন্ত উঠতে পারেন নি নলিনী। অবশ্য আবার একেবারেই যে বোঝেননি এমনও নয়। এতগুলো বসন্ত তো পার করেই এসেছেন। কোন পুরুষের চোখে-কী থাকে তা একেবারেই না-বোঝার মতো কোনো নারীই নন। কিন্তু সেই কথাটা বোঝার কাছাকাছি এলেই তাঁর মনে এমনই ঝড় ওঠে, বুকের মধ্যে এমনই তোলপাড় করতে থাকে যে, ভয়ে বুক কাঁপে।

বড়ই ভয় করে বোঝাবুঝির আরও কাছে যেতে।

সত্যিই নলিনী খুবই ভয়ে ভয়ে আছেন। মানুষটির ফেরার দিন যতই এগিয়ে আসছে, নলিনীর ভয়ও যেন ততই বাড়ছে। বুক দুরদুর করে সবসময়ই। কিছু চেয়ে বসলে 'না' করতে পারবেন না উনি। অত জোর ওঁর বুকে নেই। কোনো কোনো ভিখিরী, ডাকাতের চেয়েও বেশি। আত্মবিশ্বাসী হয়।

পরশু রাতে জ্যোতিষকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। খুবই ভয় পেয়ে গেছিলেন নলিনী। হঠাৎই ঘুমের মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর খাটের পায়ের কাছের হাতলওয়ালা বার্মা সেগুনের চেয়ারটাতে বসে নলিনীর দিকে চেয়ে আছেন জ্যোতিষ।

নলিনী চোখ খুলতেই বললেন, কী হচ্ছেটা কী ? বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক যেমন করে বলতেন জ্যোতিষ। ঝড়ের আগে। চোয়ালদুটি শক্ত হয়ে আসতো। চোখের দৃষ্টি স্থির পাথরের চোখের মতো।

শীতের মধ্যেও ঘেমে উঠলেন নলিনী। উঠে বসে কম্বল সরিয়ে দিলেন পাশে। বুকটার মধ্যে আবার সেই ধুকধুকানি ফিরে এলো। জল খেলেন উঠে এক গ্লাস ঢকঢক শব্দ করে।

রানী দুর্গাবতী কলেজের ঘড়িতে রাত দুটো বাজলো।

বাথরুমে গিয়ে মুখে-চোখে অনেকক্ষণ ধরে জল দিয়ে ফিরে এসে শুয়েছিলেন আবার।

কোনো মানুষেরই সবই দোষ বা সবই গুণ এমন হয় না। দোষে এবং গুণে মিশিয়েই প্রত্যেকে। জ্যোতিষের মধ্যেও গুণ ছিলো অনেকই। যেমন শুভাশিসের মধ্যেও আছে। আসলে একজন পুরুষ এবং একজন নারী যে গুণগুলিকে দাম বলে মনে করেন, সেই গুণগুলি একে অন্যের মধ্যে দেখতে পেলেই তাঁদের জীবন সুখের হয়। একজনের কাছে যা গুণ, অন্যজনের চোখে তা দোষ।

নলিনীর সঙ্গে জ্যোতিষের কিছু রাজযোটক মিল ঘটেনি। কিন্তু নলিনীদের প্রজন্মে স্বামী কেমন তা ভাববার মতো মানসিকতাও মেয়েদের মধ্যে জাগতে দেওয়া হতো না। স্বামী ছিলেন এক ধরনের অ্যাবসল্যুট, আলটিমেট ব্যাপার। একজন মেয়ের জীবনের শেষ কথা। স্বামী ঘিরেই তার জীবনকে গড়ে তুলতে হবে, সমস্ত জীবনই হবে স্বামী-ময়। পতি পরম গুরু এই ছিলো মন্ত্র তখন।

॥ ৮ ॥

গিগি স্কুল থেকে একটি ক্লাস না-করেই বেরিয়ে এসে একটা রিক্সা নিলো। স্কুলের সামনে যে চেনা-জানা রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে থাকে তাদর একজনকেও নিলো না। ওরা সবাই-ই চেনে ওকে। ওর বাড়িও ওদের জানা। কেউ কেউ ভৃগুকেও চেনে। তাইই ...

এখন গিগি বাড়ি যাবে না।

চিকি শ্রীবাস্তব আজ ছুটি নিয়েছে। অসুহুতা কারণ দেখিয়ে। কিন্তু আসলে সে অসুহ নয়। গিগির সঙ্গে ও ভালো করে কথা বলতে চায়। তাইই সকাল থেকে গিগির আসার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আগে কথা ছিলো যে লাঞ্চ খাবে একসঙ্গে। গিগি অবশ্য বারোটা নাগাদ স্কুল থেকেই ফোন করে দিয়েছিলো যে লাঞ্চ খাওয়া হবে না। পরে যাবে।

কিছুটা হেঁটে এগোলো।

মিসেস ত্রিপাঠী ওকে হেঁটে এগোতে দেখে বললেন, কী ব্যাপার ! হেঁটে যে !

না। ঐ চৌরাস্তার মোড়ে ফারনিশিং -এর দোকানে যাবো একটু। কাজ আছে। সেরেই রিক্সা নেবো।

ও !

বলেই, মিসেস ত্রিপাঠী স্কুলের ভিতরে চলে গেলেন।

কিছুটা এগিয়ে তাকে তার চেনা কেউই লক্ষ্য করছে কী না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিয়ে একটি অচেনা রিক্সাওয়ালাকে ডাকল গিগি হাতডানি দিয়ে। তারপর চিকির বাড়ির দিকের পথ ধরে বলে দিয়ে শক্ত হয়ে বসল রিক্সাতে।

দরজাটা চিকিই খুলল।

আগে থেকেই তার বেয়ারা-কাম কুককে সিনেমাতে পাঠিয়েছিলো চিকি। দরজা বন্ধ করেই গিগিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, লম্বা-চওড়া স্পোর্টসম্যানের চেহারার চিকি পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলো ওকে। এবং প্রায় টানতে টানতেই গিগিকে ওর শোবার ঘরে বিছানার দিকে নিয়ে গেলো। অনভ্যাসের পরপুরুষের চুমু বড় মিষ্টি লাগে। থরথর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত শরীর। চিকির সঙ্গে ও শোবার ঘর অবধি গেলো ঠিকই কিন্তু খাটে না বসে, পাশের ছোট্ট সোফাটিতে বসলো। একটু আড়ষ্ট হয়ে। ওর হাত ছাড়িয়ে নিলো।

চিকিকে বললো, এককাপ চা খাওয়াও আগে। আই অ্যাম থারস্টি!

চিকি নিজেই চা করে আনতে গেলো।

যাবার সময় বললো, আর তোমারই জন্য আভেন-এ কেক বানিয়েছি। খেয়ে দেখো, কেমন হয়েছে। আমার এক কাকা ছিলেন, অল্পবয়সে মারা না গেলে ইন্ডিয়ার সেরা শেফ্ হতে পারতেন। যদিও পেশাতে ছিলেন কমোড-কারখানার মালিক। তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি।

গিগি কথা বললো না, রান্নাঘরের মধ্যে চিকির মিলিয়ে-যাওয়া কথা শুনতে শুনতে চিকির শোবার ঘরের ভিতরের চারিদিকে তাকালো। দারুণ ডাবল-বেড খাট। দামী বেডকভারে ঢাকা। ড্রেসিং টেবলের উপর ঝুনুর ফোটা একটা তাতে সাদা ফুলের মালা পরানো ছিলো। ফুলগুলো শুকিয়ে গেছে। হাসছে ঝুনু। সরল, পবিত্র, সতীত্ব অটুট রেখে হঠাৎই এই সুন্দর পৃথিবী থেকে চলে-যাওয়া ঝুনু।

সিলী। আটারলী আনটাইমলী, এন্ড সিলী!

কিন্তু ওর এই বোকামীর মধ্যেই কোথায় যেন শ্রদ্ধা করার মতোও কী ছিলো। যদিও ও ঝুনুকে বোকাই বললে। তবু! কে জানে? হয়তো বোকারই একমাত্র জানে বোকামির আনন্দ!

চিকি ট্রেতে করে লপচু চা ভিজিয়ে, ট্রের উপরে প্লেটে কেক বসিয়ে নিয়ে এলো। একটি ফেডেড জিনস্ আর মেরুন-রঙা হাতওয়ালা গরম গেঞ্জি পরেছে ও। ওর শরীরের বাঁধুনীটা দারুণ। ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি কবিতাতে পড়েছিলো গিগি যে, পোশাক-পরা পুরুষ দেখেও তার শরীরের গঠন কেমন তা বোঝা যায়। কোথায় পড়েছিলো? খুব সম্ভব, লীভস-অফ-গ্রাস-এ।

দার্জিলিং লপচু চায়ের গন্ধ বেরুচ্ছিলো। ভালো চা, ভালো জীবনেরই মতো, বড়ই ভালোবাসে গিগি।

ভুণ্ড রায়ের মতো সরকারী ব্যাঙ্ক অফিসারের পক্ষে, যার ভবিষ্যত উন্নতির মাপ এখন মোটমুটি জানা হয়ে গেছে ওর। এই ইনফ্লেশানের বাজারেও গিগি যে জীবন চায়, ভালোবাসে; তা কখনোই দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও অনেকেই মেয়ের কাছে ভুণ্ডর মতো ব্যাঙ্ক অফিসার স্বামীই স্বর্গের ধন। কিন্তু কথাটা সত্যিই। তাছাড়া গিগির নজরটা ছেলেবেলা থেকেই উঁচু। চিকির সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই পেরে ওঠেনি, পারবেও না ভুণ্ড। টুটু তাদের ছেলে বটে, তবে ছেলে বলেই যে তার প্রতি যে বিশেষ কোনো অ্যাটাচমেন্ট গিগির আছে, এমন নয়। ও এত তাড়াতাড়ি এসব ঝামেলা চায়ও নি। ভুণ্ড আর তার মা-ই দায়ী এ জন্যে। মায়ের নাকি সময়ই কাটে না। খেলনার নাকি দরকার ছিলো। তাইই গিগিকে মা হতে হলো। সিলী! ওর মধ্যে কোনো মাদারলী সেন্টিমেন্টই গড়ে ওঠেনি। বাকি জীবনও যে উঠবে তা মনে হয় না।

এসব ফালতু সেন্টিমেন্টকে ঘেন্না করে গিগি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে দিব্যিই বড় হয়ে উঠছে, নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছে, নিজেদের জীবনে সুখী হচ্ছে। মা-বাবার স্নেহ ভালোবাসা এটসেট্রা না পেলে, বাবা-মা সেপারেটেড হয়ে গেলেই যে, ছেলেমেয়েরা কিছু জন্তু বা যাচ্ছে এইরকম কথায় গিগি একেবারেই বিশ্বাস করে না।

যুক্তি তার স্বপক্ষে অনেকেই আছে ঘর বদল করার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, যাকে ছেড়ে যাবে সেই ভুণ্ডকে নিয়েই। ও একটা ইডিয়ট। এতো চোখ-বাঁধা বলদের মতো সোজা আর ভালোমানুষ আজকের এই পৃথিবীতে সত্যিই অচল। যদি গিগি সত্যি সত্যিই চলে যায় চিকির কাছে তবে ওকে সেই ধাক্কাটা একেবারেই ধরাশায়ী করে দেবে। দুষ্টু লোককে দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লোককে দেওয়া কষ্ট নিজের বুকেই ফিরে আসবে না কি পরে?

ভুণ্ড সাধা খুবই সীমিত, বিবাহিত জীবনের অনেকই ক্ষেত্রে। কিন্তু সাধার সবটুকুই নিঃশেষ সে করে। কিছুমাত্রই হাতে না রেখে। গিগিই তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। জোতিষ আর নলিনী রায়ের ছেলে ভুণ্ড রায়ের অক্ষমতা অনেকই এবং অনেক রকম। কিন্তু সে সৎ, সচ্চরিত্র এবং গিগি-গত-প্রাণ।

একটা কাগজ বের করলো চিকি হিপ পকেট থেকে। বললো, এই হিসেবটা কষে রেখেছি।

কি ?

বাঃ। তুমিই তো বলেছিলে। আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটা লিস্ট, চাকরীর উন্নতির সম্ভবনা, সুপার-অ্যানুয়েশানের সময় ফিনান্সিয়াল অবস্থা ঠিক কীরকম হবে ; এইই সব।

হ্যাঁ। চিকি বললো।

কাগজটাতে চোখ বোলালো চা খেতে খেতে একবার গিগি। ওপর ওপর। তারপর প্রশংসার চোখে চাইলো চিকির দিকে। বললো, তুমি শুধু বড়লোকের ছেলেই নও ; নিজের অধিকারেও তুমি বড়লোক। খুবই ভালো। বাবার পয়সার বড়লোকী আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে কেউই করতে পারে না।

চিকি হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে, অসহিষ্ণু গলায় বললো, নাও তাড়াতাড়ি চাটা খেয়ে নাও। আমার আর তর সইছে না। সিনেমা তো শেষ হবেই একসময়। হাতে সময় আমাদের খুবই কম। আই অ্যাম ডায়িং ফর ইট, হানি !

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে গিগি বললো, সকলেরই তাই। মানে, কম। সময়। ওর দিকে মুখ তুলে বললো, তোমরা পুরুষেরা ভালোবাসা বলতে শুধু শরীরের ভালোবাসাটাই বোঝে, না ?

তারপরই বললো, চলো ড্রইংরুমে গিয়ে বসি আমরা। বেডরুম ছেড়ে।

কেন ? প্রচণ্ড আশাভঙ্গতার সুরে চিকি।

এমনিই !

তারপরই বললো, ঝুনুর ফোটার দিকে চেয়ে ফোটাটাকে নতুন মালাওতো দিতে পারতে একটা একটা। এতো গভীর ভালোবাসার ফুল এতো তাড়াতাড়িই শুকিয়ে গেলো ?

ওঃ। আই অ্যাম সরী। আসলে ভেবেছিলাম, ঐ ফোটোটাই সরিয়ে দেবো বেডরুম থেকে। ওখানে তো তোমারই ফোটো থাকার কথা ছিলো। মানে, থাকবে।

যে-মানুষ মালা ভালো করে শুকোবার আগেই যার ফোটোর গলায় মালা পরানো তাকেই ভুলে যায় ; সেই মানুষকে বিশ্বাস করি কি করে বলো ? আমার ছবি সরিয়ে আবার অন্য কারো ছবি তো বসাতে পারো, স্বল্পসময় পরেই।

চিকি উত্তেজিত হয়ে বললো, ডোন্ট বী ক্রাইজী !

তুমি ঝুনু কি এক হলে ?

এক নই। জানি যে এক নই। কিন্তু ফেলে-আসা দিনের ঝুনুও তো আজকের অবহেলার চলে-যাওয়া ঝুনু ছিলো না। আজকের আমিও তোমার চোখে সহজেই অন্যদিন অন্য গিগি হয়ে যেতে পারি।

বলেই, ড্রইংরুমে যাওয়ার জন্যে এগোলো ও চায়ের কাপ হাতে নিয়েই।

চিকি গিগির পথ আটকে দাঁড়ালো। বললো, একটু পরে যেও। প্লীজ গিগি। প্লীজ লেট মী হ্যাভ ইট। আই রিয়্যালী অ্যাম ডাইং ফর ইট।

গিগি ক্লিওপেট্রার মতো হেসে বললো, ওয়েল, ইন দ্যাট কেস, ডাই। মাই ব্রেভ, ইনোসেন্ট, লাভার। মরে প্রমাণ করো যে, সত্যিই আমাকে তুমি ভালোবাসতে। সব পুরুষরাই মুমূর্ষুর অভিনয় দারুণ ভালো করে। কিন্তু মরে না। তাদের প্রাণও বুনো, শুয়োরের মতোই শক্ত।

এবারে চটে গেলো চিকি। বললো, এ কী রসিকতা ? তোমার জন্যে আমি অফিস কামাই করে, চাকরকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়ে ঘরে বসে আছি আর ...। তাছাড়া, তুমি কি আগে আমার সঙ্গে ...। দিস ইজ নট দ্যা ফার্স্ট টাইম !

গিগি ড্রইং রুমের দিকে যেতে বললো, তখন ঝুনু ছিলো। ইট মেড অল দ্যা ডিফারেন্স। একজন জবরদস্ত প্রতিপক্ষ ছিলো আমার। ওয়াক-ওভারে কোনো খেলাতেই জিতরে চাই না আমি। সে জিৎ, জিৎই নয়। সেদিন ঝুনুকে হারিয়ে দারুন এক আনন্দ পেয়েছিলাম। কারণ সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর গর্ব ছিলো। আজকে ...

স্ট্রেঞ্জ !

চিকি বললো, আনন্দ ঝুনু দিয়েছিলো তোমাকে, না আমি দিয়েছিলাম ?

গিগি সোফাতে বসতে বসতে বললো, সেক্স ইজ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সাইকোলজিক্যাল। পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে-আমি দেব হাসে অন্তর্যামী !

সেটা আবার কি ? অত বাংলা আমি জানি না ।

না জানলেও চলবে । তুমি খুব ভালো ছেলে । তোমার জন্যে দারুণ একটি মেয়ে দেখে দেবো আমি । কথা দিচ্ছি । তিন মাসের মধ্যে ।

স্ট্রেঞ্জ ! তোমরা ! তোমাদের বোঝা দায় !

স্বগতোক্তি করলো চিকি ।

হোয়াই ? তোমার বৌ পছন্দ করার পেছনে আমারও একটা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট তো থাকতেই পারে । হয়তো থাকবেও । হয়তো তোমারও ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকবে ।

কেন ? মানে বুঝলাম না তোমার কথার ।

প্রতিপক্ষ হিসেবে তোমার বৌ যদি যথেষ্টই যোগ্য হয়, তাহলে তাকেও হাবাবার খেলাতে নামতেও বা পারি । নতুন করে নইলে নয় । এবেবেলে প্রতিপক্ষর সঙ্গে আমি খেলি না ।

তারপর আর দুটি সুন্দর হাতের সব ক'টি আঙুল ছড়িয়ে দিয়ে হাতদুটিতে ঢেউ তুলে গিগি আবার বললো, জানো চিকি আসলে না, আমি আমাকে একটুও বুঝি না । কী যে চাই আমি ? কীসে আমার সুখ ? ... সত্যি ... ।

বলেই বললো, ভৃগুর ব্যাঙ্কে একবার ফোন করো না ।

চমকে উঠলো চিকি ।

বললো, তুমি কি পাগল ? এখান থেকে ? আমি ? ও সন্দেহ করবে না ?

হাসলো গিগি, ঈশ্বরীর মতো । বললো, নাঃ ও আমাকে কখনওই সন্দেহ করে না ।

সব পুরুষ নয়, কিছু পুরুষ থাকে ভৃগুর মতো । আমি -ময় । ওদের চেয়ে ভালো যে কেউ থাকতে পারে এই কথাটা তাদের বিশ্বাসের বাইরে ।

আসলে, তোমার হাজব্যাণ্ড ভৃগু, একসকিউজ মাই সেয়িং সো ; ইজ আ স্টুপিড চ্যাপ ।

উষ্মার সঙ্গে বললো, অনপোনোদিত কামে, বিরক্ত, ক্ষুব্ধ চিকি ।

স্টুপিড চ্যাপস্ মেক দ্যা বেস্ট অফ হাজব্যান্ডস । যুগে যুগে মেয়েরা শিবের মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢেলেছে ভৃগুর মতো স্টুপিড হাজব্যান্ডদেরই প্রার্থনা করে । তুমি সব বোঝ না চিকি । ভৃগু স্টুপিড বলেই তো তোমাদের মতো ইন্টেলিজেন্টরা টিকে আছো ।

থ' মেরে বসে রইলো চিকি ।

নাও । ডায়ালটি করো এবারে । নইলে আমাকেই দাও ফোনটা এগিয়ে ।

বলে, নিজেই ডায়াল ঘুরালো ভৃগুর ডায়বেকট্ নাম্বারে ।

কী হচ্ছে ? কার সঙ্গে প্রেম করা হচ্ছিলো ? অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি, লাইন পাচ্ছি না ।

গিগি বললো, ভৃগু ওপাশ থেকে ডায়রেক্ট লাইনে 'হ্যালো' বলতেই । ও-পাশ থেকে ভৃগু কি বললো শোনা গেল না ।

গিগি আবারও বললো, স্কুল-ফেরতা চিকির কাছে এসেছি । ও বেচারী এইমাত্র এলো । ওকে বাড়ি পৌঁছতে বলতে খারাপ লাগছে । তুমি আমাকে অফিস-ফেরতা তুলে নেবে ?

একটু চুপ করে থেকেই গিগি বললো, কী বলে ? চিকি আজ অফিসই যায়নি ? তুমি ফোন করেছিলে ? ধরো, ধরোতো একটু দিচ্ছি তাকে । আর এদিকে আমাকে অম্লানবদনে অমন ডাহা মিথ্যে কথাটা বলে দিলো ! যেন, কাতই ক্লান্ত অফিস করে । দ্যাখো, কার সঙ্গে প্রেম করছিলো । ঝুনুর ফোটোর মালার ফুল এখনও শুকোয়নি । ছিঃ ছিঃ । তোমরা পুরুষেরা এইরকমই । এই নাও ।

বলেই, হতভম্ব চিকির হাতে রিসিভারটি উঠিয়ে দিলো ।

॥ ৯ ॥

কাল রাতেও নলিনী আবার স্বামীকে স্বপ্ন দেখেছিলেন ।

মুখটা ভারী গম্ভীর, থমথমে । ওপার থেকে জ্যোতিষ যেন নলিনীর এই চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে খুবই বিচলিত ?

তবে কথা বললেন না কোনো ।

নলিনী কি কোনো করছেন ? সামান্য একটু আনন্দিত হওয়ার কি পাপের ? দেবতার আশীর্বাদী ফুলের মতো বাড়া মুকুল দিনশেষে পৌঁছে যদি চিতে জাগেই তবে কি তা গর্হিত অন্যায় ? মনে মনে একজন মানুষকে ভালো লাগাও কি অমার্জনীয় অপরাধ ? স্বামীর অবর্তমানেও ?

উনি কাল কোনো কথা বলেননি বললে, বোধ হয় নলিনীও এবার ছেড়ে কথা কইতেন না। জীবনটাতো নষ্ট হয়েই গেছে। সন্ধ্যের পরে একটু আগুন পোওয়াবেন, একটু উষ্ণতায় শীতার্ত হাত সেঁকে নেবেন শীতের রাতে, তাতে কারোই কিছু বলার থাকতে পারে না। তাঁর মৃত স্বামীর নয়, তাঁর ছেলে-বৌ-এর নয়। কিছু বললে, খারাপ হয়ে যাবে।

এত জোর কোথায় যে লুকিয়ে ছিলো নলিনীর মতো নরম, অভ্যেস অভ্যেসে জর্জরিত, প্রায় অমানুষ হয়ে যাওয়া মানুষটির মধ্যে তা ভেবে নিজেই চমকে উঠছেন। ভালোবাসা কি মানুষকে সাহসী করে তোলে ? নইলে, যে জোর তাঁর আদৌ ছিলো বলে ঘুণাক্ষরে জানেননি সেই জোর এই রাতের বেলায় আসে কোত্থেকে ? নলিনী বুঝতে পারেন আজকাল যে, আঘাতেই প্রতিঘাত ওঠে। প্রত্যেকের জীবনেই তাই বাধার প্রয়োজন আছে। বাধা না এলে নিজের ভেতরের জোরের যাচাই হয় না। যাচাই না করেই নিজেই নিজেকে এতদিন বাতিল করে রেখেছিলেন বলে নিজেকে আজ মনে মনে অভিসম্পাত দেন তিনি।

টুটুর আসার সময় হলো। অথচ এখনো ফিরলো না বাটুমা। ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে টুটুর খাবার ঠিক করতে গেলেন উনি। গ্যাসটা জ্বালতে গিয়ে আঙুল পুড়ে গেলো ; আজকাল এরকম প্রায়ই হচ্ছে। বড়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন উনি। কাল থেকেই শুভাশিসের পায়ের আওয়াজের প্রত্যাশা করছেন। চিঠি পাননি গত তিনদিন।

একটি গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ হলো বাইরে। চেনা শব্দটা। কার গাড়ি এলো অসময়ে ? শুভাশিস নন তো ? যে-কোনো সময়েই ফিরে আসতে পারেন মানুষটি। এ কথা মনে হতেই তাড়াতাড়ি গ্যাসটা নিভিয়ে দিয়ে একদৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি মুখটি ধুয়ে ড্রেসিং টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ব্রস্ত হাতে ঠিক করে নিলেন।

গাড়িটা হর্ন বাজাচ্ছিলো।

এমন সময় বাটুমার উত্তেজিত গলা শুনতে পেলেন। ভাবলেন, বাটুমার যখন এতো উত্তেজনা তখন শুভাশিসই নিশ্চয়ই। ঘরের বাইরে না বেরিয়ে জানালা দিয়েই দেখলেন যে, টুটুকে কোলে করে নামাচ্ছেন দু'জন ভদ্রমহিলা।

কী হলো ?

নলিনীর সব সুখস্বপ্ন উবে গেলো। কী হলো বাটুমার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লেগে গেলো ওর।

বাটুমা উত্তেজিত হয়ে বললো মা, টুটু অজ্ঞান হয়ে গেছিলো স্কুলে।

সে কিরে ? কেন ?

জানি না স্কুলের দিদিমণিরা তাই হেড-দিদিমণিদের গাড়িতে করে ওকে নিয়ে এসেছেন। ডাক্তারও ডেকেছিলেন ওঁরা।

সে কি ? বলেই আতঙ্কিত নলিনী দৌড়ে এলেন বসবার ঘরে।

ততক্ষণে ওঁরা টুটুকে ভিতরে নিয়ে এসেছেন। নলিনী বললেন, বাটুমা তোর দাদা তার বৌদি দু'জনকেই ফোন কর। বলেই, মনে পড়ল ফোনতো খারাপ হয়ে গেছে সকালে। এ পথেই নতুন পড়োশীর ফোন আসছে তাই রাস্তা সকাল থেকে খোঁড়াখুড়ি চলছে।

টিচারদের মধ্যেই একজনকে বললেন, আমরা দু'জনকেই ফোন করেছিলাম, ওঁরা ক্লাবে গেছেন টেনিস টুর্ণামেন্ট দেখতে। আজ ফাইন্যাল। ক্লাবেও আমরা লোক পাঠিয়েছি চিঠি দিয়ে।

কি হয়েছিলো ?

নলিনী ভয়ে সিঁটিয়ে শুধোলেন।

এক্ষুনি তো সঠিক বলা যাবে না। স্কুলের ডাক্তার তো বললেন ছেলে খুবই অ্যানিমিক হয়ে গেছে। ম্যালনিউট্রেশানেও ভুগছে। ওর খাওয়া দাওয়া কি ঠিক হয় না ?

নলিনী কি বললেন ভেবে পেলেন না। স্তম্ভিত হয় রইলেন। শুভাশিস আসার পর থেকে ছেলেটাকে বড়ই অযত্নও করেছেন। বড় অপরাধ বোধ করলেন তিনি।

বললেন, মুখে, না তো ? মানে, ঠিকই তো হয়।

আপনাদের ফ্যামিলি ফীজিসিয়ানকে ডাকুন। অজ্ঞান হয়ে অনেকক্ষণই ছিলো।

এখনও তো জ্ঞান নেই দেখছি।

না, না। জ্ঞান এসেছে তবে খুব দুর্বল বলে চোখ খুলছে না।

নলিনী ওঁর ঘরের খাটে টুটুকে শোওয়াতে শোওয়াতে ডাকলেন, দাদু ! টুটু দাদু !

টুটু সাড়া দিলো না কোনো। চোখও মেললো না।

নলিনী কাঁচুমাচু মুখে বললেন, আমার বড় ভয় করছে। আপনারা আর একটু থাকুন। ওকে একেবারে হাসপাতালে নিয়ে যাবো কি ?

না, না। আমাদের ডাক্তার বলেছেন এক্ষুনি প্যানিকের কোনো কারণ নেই। তবে থরো ইনভেস্টিগেশানের দরকার। এই যে একটি প্রেসক্রিপসনও লিখে দিয়েছেন উনি আর কী কী টেস্ট করতে হবে তাও। আপনাদের ডাক্তার এলে দেবেন। ডঃ চতুর্বেদী দেখেছেন। নাম-করা চাইল্ড স্পেশালিস্ট।

কী মনে করছেন ডঃ চতুর্বেদী ?

টিচাররা দু'জন মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কী যেন বলতে গিয়েও বললেন না।

এমন সময় খুব জোরে গাড়ি ফিরল ভৃগু। গিগিকে নিয়ে। গিগির আগে আগেই ভৃগুই দৌড়ে এলো। টিচাররা যা বলেছিলেন নলিনীকে, তাই-ই বললেন ওদেরও। তারপর প্রেসক্রিপশানটা হাতে দিয়ে বললেন আমরা আসি তাহলে। এই টেস্টগুলো কিন্তু করাবেন। দরকার হলে নার্সিং-হোম বা হাসপাতালেই রেখেই। খোঁজ নেবো আমরা। কালকে আসব আবার। আমরা এবার যাই, নইলে আমাদের স্বামীরা আমারদেরই খোঁজে থানা-পুলিশ করবেন। এত দেরী করে তো বাড়ি ফেরা কখনোই হয় না।

ওঁদের গাড়ি অবধি দিয়ে এলো গিগি। একজনকে মিসেস সেন বলে সম্বোধন করছিলো গিগি। শুনলেন, নলিনী। তারপর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কী সব আলোচনা করলেন মিসেস গিগির সঙ্গে।

গিগি ফিরে এলো নলিনীর ঘরে। ভৃগু ছেলের পাশেল বার্মা-সেগুনের হাতলওয়ালা চেয়ারটাতে বসে তার মুখে একদৃষ্টে চেয়েছিলো।

গিগি বললো, শুনছো, কী বললেন ওঁরা ?

কি ?

ছেলেকে নাকি খাওয়া-দাওয়া কিছুই করানো হয় না ঠিকমতো। অসময়ে অনিয়মে, অবহেলায় টুটুর এই অবস্থা। বলার কিছুই নেই।

বলেই নলিনীর দিকে ফিরে গিগি বললো, টুটুকে কি দুধটুধ দিতে না মা ? ডিম ? মাছ মাংস তো ও ভালোই বাসে না।

নলিনী স্তব্ধ হয়ে ছিলেন টুটুর অবস্থা দেখে উদ্বেগে। এখন স্তব্ধতর হলেন অপমানে।

বাটু মাই বললো, দুধ কেন খাবে না টুটু। সবই তো খায় !

তুই চুপ কর।

রাগতস্বরে বললো ভৃগু। বড় বেশি কথা বলিস তুই বাটুমা। সবসময়ে এত কথা ভালো লাগে না।

নলিনী, তাঁর ছেলে-বৌমাকে উপেক্ষা করে টুটুকে পাশে গিয়ে বসে বাটুমাকে বললেন, দুধটা গরম করে নিয়ে আয় তো।

বলেই, টুটুর ডানহাতটি নিজের হাতে নিয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন, দাদু ! ও দাদু ! কি হলো তোমার ?

বলতেই, দিদা! দিদা। বলে নলিনীকে জড়িয়ে ধরলো টুটু দু'হাত দিয়ে। ক্ষীণকণ্ঠে বললো, তুমি আমার পাশে শোও।

নলিনী না শুয়ে বললেন তোমার মা-বাবা এসেছে দেখো। ঐ দেখো বসে রয়েছে মা আর বাবা।

টুটু সে কথাতে ভ্রূক্ষেপও না করে আবারও বললো দিদা তুমি আবার পাশে শোও।

গিগির বড় দুঃখ হলো। পরাজিত সম্রাজ্ঞীর মতো মনে হলো নিজেকে। যে-সন্তানের জন্ম সে দিয়েছে, যাকে গর্ভে বয়েছে দশ মাস সাতদিন তার কাছেই তার মায়ের, গর্ভধারিণীর কোনোই দাম নেই। জন্মই দিয়েছিলো শুধু। আর কিছুই করেনি। বুকের ছাঁদ নষ্ট হয়ে যাবে বলে স্তন্যপান করায়নি একদিনও শিশুকে। শিশুর প্রাপ্য স্তন্য বরং শিশুর পিতাই কিছু পান করেছিলো। তারপর থেকে নলিনীই এই ছেলেকে বুকে করে মানুষ করেছেন। নিজের সন্তানকে গিগির হাতে নিঃশর্তে তুলে দিয়ে গিগির সন্তানকে নিজে বুকে তুলে নিয়েছিলেন। আজকের গুরুতর অসুস্থ টুটুর ব্যবহারই প্রমাণ করে দিলো যে, ভৃগু এবং গিগি টুটুর পোশাকি বাবা মা। জন্মদিনে বেলুন আর ফুল সাজানো আলোকোজ্জ্বল ড্রয়িংরুমে ঝলমলে শাড়ি পরে বিলিতে পারফ্যুম মেখে বন্ধুদের সামনে বার্থডে কেক কাটার সময়ে একজন মাকে সব শিশুরই যেমন দরকার হয়। "সেরিমনিয়াল" মা, গিগি তেমন মাই হয়ে থেকেছে টুটুর কাছে। শিশুর কাছে ফাঁকি চলে না। মাতৃস্নেহের ফাঁক থাকলে তাতো ধরা পড়ে সবচেয়েই আগে।

কিছুক্ষণ বোকার মতো নলিনীর অন্ধকার হয়ে-আসা ঘরে বসে থেকে টুটুর বাবা-মা নিঃশব্দে উঠে নিজেদের ঘরে চলে গেলো। বাটুমা দুধ'টা নিয়ে এলো। গিগি যাওয়ার সময়ে বললো দেখে-টেখে তাই-ই করতে হবে।

কথাটা এমনভাবে বললো, গিগি, যেন নলিনীর অনুমতিই চাইছে।

নলিনী কিছু বললেন না। টুটুর জন্যে ক্লিষ্ট হলেও নিজের জন্যে আনন্দিত হলেন। এই শিশু তাঁর মমত্বর, সেবা যত্নর অমর্য্যাদা করেনি। তার দুঃখের মুহূর্তে সে নলিনীকেই চেয়েছে দু'হাত বাড়িয়ে। যে মা, শুধুমাত্রই জন্মদাত্রী, তার দিকে ফিরে তাকায়নি একবারও। তাকে সে যে চেনে এমন লক্ষণটুকু পর্যন্ত ফুটে ওঠেনি তার মুখে।

নলিনী টুটুকে জড়িয়ে ধরে উঠিয়ে বসালেন। বাটুমা দুধ'টা নিয়ে এলো কাছে। নলিনী বললো, দাদু! খেয়ে নাও তো দুধ'টা লক্ষিটি। তারপর আমি আর তুমি সাপের লুডো খেলব। কেমন?

দুধ'টা পুরো খেলো না টুটু। বললো, না দিদা। আজ নয়। তুমি আমার পাশে শোও। আজ বাটু দাদাকে মাথা টিপে দিতে বলো। তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না দিদা।

বাটুদাদা মাথা টিপলে তোমার-মা বাবাকে খাবার চা এসব দেবে কে দাদু? আমি দিচ্ছি মাথা টিপে। এসো, আমরা শুই, কেমন?

বাটুমা চলে যেতে বললো, আপনার চা কি গ্লাসে করে আনব মা।

নলিনী মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

তারপর টুটুকে একহাতে জড়িয়ে ওর পাশে শুয়ে অন্য হাতে মাথা টিপতে লাগলেন।

কী হলো ছেলেটার কে জানে? মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। রক্ত কম কেন বললো, স্কুলের ডাক্তার? রক্ত কম হওয়ার তো কথা নয়। টুটুর ম্যালনিউট্রেশানে ভোগারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং নেই বলেই নলিনীর বড় দুশ্চিন্তা হতে লাগলো। যা দিনকাল পড়েছে! অসুখের তো কোনোই মাথামুন্ডু নেই। পুরোনো দিনের মানুষ এইসব নতুন অসুখের নামও সব জানেন না।এবং জানতে চানও না আদৌ।

॥ ১০ ॥

ব্যাপারটা যে ঠিক এরকম দাঁড়াবে স্বপ্নেও ভাবেননি নলিনী।

শুভাশিস এসেছেন কাল রাতে। গিগি আর ভৃগু ডাক্তার ঘোষের কাছে গেছিলো টুটুর রক্তের রিপোর্ট নিয়ে একো টেস্ট হয়েছে। বোনম্যারো টেস্ট। ঈসস এতটুকু শিশুর যে কী কষ্ট। ছেলেটা এই তিনদিনে ভয়ে, সিরিঞ্জের ফুটোয় ফুটোয় যেন একেবারে সিঁটিয়ে গেছে।

শুভাশিস যে ফিরে এসেছেন তার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। নলিনীকে একমুহূর্তর জন্যেও ছাড়ছে না টুটু। নলিনীও ছাড়ছেন না তাকে। শুভাশিস আজই সকালে গিয়ে টুটুর লাল রঙা সাইকেলটা নিয়ে এসেছেন। নলিনীর সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন নিচু গলায়। বলেছিলেন বেয়াই মশাই, এখন নয়; এখন নয়।

শুভাশিসও আসার পর থেকেই প্রায়ই সবটুকু সময়ই নলিনীর ঘরেই জ্যোতিষের বার্মাসেওনের হাতওয়ালা চেয়ারটিতে বসেই কাটিয়ে দিয়েছেন। টুটুর সেবা করা নলিনী সর্বক্ষণ বুঝতে পেরেছেন একজোড়া তৃষিত চোখ অনুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

এক সময় বলেছিলেন, কপাল দেখুন! দাদু কী কাণ্ড যে বাধালো। কত কী ভেবেছিলাম! এখন ছেলেটা ভালোয় ভালোয় সুস্থ হয়ে উঠুক!

হুঁ।

শুভাশিস বলেছিলেন।

আজই দুপুরে হঠাৎ শব্দ শুনে চমকে উঠেছিলেন নলিনী। শুভাশিস অর্গানের ডালা খুলে ডো রে মি ফা সো ল্যা টি ডো ...

বাজিয়েছেন চাবি টিপে টিপে সাবধানী, সংকোচের আঙুলে। তা শুনে ছাদের আলসে থেকে উড়ে গেছে শীতের দুপুরের রোদপোয়ানো পায়রারা ডানা ফরফরিয়ে। একা একা বাড়ির মধ্যে আর বাগানের ঘুরে বেরিয়েছেন নির্বাক হয়ে যাওয়া, উচ্ছল শুভাশিস। টুটুও যেমন, তেমন শিশুরই মতো শিশুরই মতো বাড়িতে তিনি থাকলেও বোঝাই যাচ্ছে না তিনি আছেন।

বিকেল চায়ে এসেছে যখন তখন ঐ চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন শুভাশিস। ওঁর সামনে স্তব্ধ লক্ষ্য করেছে নলিনীর। অথচ ঘুমে তাঁরও চোখ জুড়িয়ে এসেছে। বলেছেন, এই যে বেয়াই! নিজের ঘরে গিয়ে ভালো করে ঘুমোন।

চমকে উঠে লজ্জা পেয়ে, চোখ ডলেছেন শুভাশিস।

নলিনীর আবারও বলেছেন, নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমান।

নিজের ঘর ?

ঘুম-জড়ানো চোখ তুলে স্বপ্নোত্থিতর মতো বলেছেন শুভাশিস।

তারপরই বলেছেন, সব ঘরই তো নিজের। নিজের ভাবলেই নিজের।

এরই মধ্যে এক সময় সোয়েটারটিকে পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে তুলে দিয়েছিলেন শুভাশিসকে। বলেছিলেন, গলা নামিয়ে ; পরবেন। এখানে নয় কিন্তু।

কেন ?

বলেই, শুভাশিস থেমে গেছিলেন। বুঝেছিলেন, অনুরোধটির মধ্যেই তাঁর প্রশ্নর উত্তর লুকোনো ছিলো। তারপর বলেছিলেন, ও। আচ্ছা।

অনেকই বদলে গেছেন একদিনে শুভাশিস। নলিনী ভেবেছেন।

বাইরে ভৃগুর গাড়ির শব্দ হলো।

শুভাশিস উঠলেন ঘর ছেড়ে। তারপর বাইরের দরজা খুলে গারাজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাটুমা, নলিনীর অভাবে পুরো চাপা পড়ে গেছে রান্নাঘরের এবং অন্যান্য কাজে। তার টগবগানো-কথা থেমে গেছে। ঐ শিশুটিই যে এই সমস্ত বাড়ি বিষণ্ণতায় ধুঁকছে।

গাড়ির দরজা খুলে ওরা নেমে আসতেই শুভাশিস বললেন, কি বললেন রে ডঃ ঘোষ ? গিগি ?

ঐ আর কি ওদের স্কুলের ডাক্তার যা বলেছিলেন।

ভৃগু বললো, মেজোমামা, আমি চান করতে যাচ্ছি। খাবার সময়েই কথা হবে।

হ্যাঁ। হ্যাঁ যাও।

ভৃগু চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে গিগি চাপা গলায় বললো, চলো মেজোমামা বাগানে একটু পায়চারী করি।

অবাক হলেন একটু শুভাশিস।

বললেন, চল্। ঠাণ্ডাটা বেশ। তোদের জব্বলপুরের ক্লাইমেটটা কিন্তু বেশ ভালো, যদিও কনজেস্শান হয়ে গেছে আজকাল। তবু, কলকাতার চেয়ে অনেকই ভালো, খোলা-মেলা।

গিগি উত্তর দিলো না। কোনো শুভাশিসের কথার। ওঁর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললো, মেজমামা চলো, একটু রাস্তাতেই ঘুরে আসি।

অস্বাভাবিক লাগলো গিগির গলা শুভাশিসের। কিন্তু কিছু বললেন না। উনি বুঝতে পারলেন যে, গিগি তাঁকে এমন কোনো কথা বলবে যা বলতে ওর খুবই কষ্ট হচ্ছে। এবং হয়তো শুনতেও শুভাশিসের কষ্ট কিছু কম হবে না। কী বলতে পারে তাও অনুমান করেছিলেন উনি। কারণ কানহা থেকে ফিরে আসার পর থেকেই গিগি ও ভৃগু দু'জনের ব্যবহারেই বিশেষ শৈত্য লক্ষ্য করেছেন উনি। তাছাড়া, বাটুমাও কিছু বলেছিলো। যদিও উনি নিজে কোনো খবর জানার মতো মানসিকতা তাঁর ছিলো না।

ভাবলেন, স্যুটকেসটাতো গোছানোই আছে। যদি গিগি কিছু বলে বা ভৃগুও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ওটা হাতে তুলে নিয়ে চলে যাবেন স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে। যদি না বলে চলে যেতে, তবে যাবেন না। ক'দিন থেকেই যাবেন। নিজেকে ভবঘুরে সবরকম পিছুটান-হীনই করে তুলেছিলেন। কী যে হলো ! নলিনীর সান্নিধ্য ছেড়ে যেতে মন কিছুতেই চাইছে না। যেতে যদি হয়ই, রাতটা না হয় স্টেশনেই থাকবেন। প্রয়োজন হলে। যে-ট্রেনই পাবেন আগে, অথবা যদি প্লেন পান তাতেই ফিরে যাবেন কালকে কলকাতায়, ওঁর নিজের সম্মানের চেয়েও নলিনীর সম্মানটাই অনেক বড় ওঁর কাছে। অথচ উনি জানেন যে, ওরা কেউই কোনো অন্যায় করেননি। কিন্তু ভৃগু আর গিগি জানে না যে, একদিন ওরাও বুড়ো হবে। ওদের মধ্যে একজন আগে যাবেই। যে থাকবে, সে জানবে যে এই পৃথিবীতে বড় শীত। জানবে যে, সন্ধ্যের পরে বুড়ো বা বুড়িদের বেশি শীত করে। পায়ে মোজা পরতে হয়, মাথা টুপী বা শাল দিয়ে ঢাকতে হয়। তখন একটু উষ্ণতার চেয়ে দামী আর কিছুই থাকে না জীবনে ; থাকে না কামনার। সেই সব শীতের রাত বড়ই দীর্ঘ হয়, ঘুম কমে-যাওয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বড় একলা লাগে পথের কুকুরের আর পেঁচার ডাকে চমকে-ওঠা সুনসান রাতে। শুভাশিস নিজেকে বলেন, নিজের নিজের জীবন দিয়েই কিছু জানাকে জানতে হয়। এবং যথাসময়ে। আজকের ভৃগু ও গিগির পক্ষে শুভাশিস আর নলিনীর মানসিকতা বোঝা কখনওই সম্ভব নয়। শরীর নয়, কাছে পাওয়া নয়, জাগতিক কোনো চাওনা নয় ; শুধই একটু উষ্ণতার জন্যে মন বড়ই কাঙাল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যে নেমে এলেই।

গিগি গেট খুলে পথে পড়েই বললো, লবঙ্গ খাবে মেজমামা ?

লবঙ্গ ?

অবাক হলেন শুভাশিস । হাসিও পেল ওঁর । মনে মনে বললেন, যা বলবি বলে ফ্যাল মা । তোর বলতে কষ্ট হতে পারে আমার শুনতে কষ্ট হবে না । আনন্দ অথবা কষ্ট কিছুই আর মথিত করতে পারবে না আমাকে । জীবনের যে-মেরুতে পৌঁছেছি এসে, তাতে সম্মান অথবা অপমান কিছুরই কোনো মূল্য আর নেই । আমি কী, কী আমার চাওয়া-পাওয়ার স্বরূপ তা আমার মতো করে আমি বুঝেছি । তোর বা তোদের হাতের আলোতে আমার মুখ দেখার দরকার নেই কোনো । বিবেক আমার পরিষ্কার । তোদের দেওয়া দুঃখ বাজবে না ।

মুখে বললেন, দৈ একটা ।

গিগি লবঙ্গ দিলো ব্যাগ থেকে বের করে ।

তারপর দ্বিধীভরে বললো, একটা কথা বলব মেজম্যাম ? এ কথা তোমাকেই বলতে পারি শুধু । আমার শাশুড়ীকে বলতে পারবো না । অথবা ...

বল্ না ।

ডঃ ঘোষ সন্দেহ করছেন টুটুর ব্লাড-ক্যানসার হয়েছে ।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন শুভাশিস । এতক্ষণ নিজের জগতেই ছিলেন । গিগি তাঁকে আঘাত দেবে ভেবেছিলেন । কিন্তু হঠাৎ গিগি যা বললো, তাতে তাঁর আমি-ময় জগতের নির্মোক ছেড়ে বেরিয়ে এসে একজন কন্যাসমা তরুণীর বুকের চাপা কষ্টে নিজের সমস্ত কষ্টের ভাবনাই ঝড়ের মুহে পাতারই মতে উড়ে গেল ।

গিগি বললো, ভুণ্ড খুবই নরম মনের ছেলে আর আমার শাশুড়ীর কাছে টুটুই সর্বস্ব । আমি ওর মা হতে পারি কিন্তু আসলে ...

শুভাশিস গিগির কাঁধে হাত রাখলেন । একটা সোনাঝুরি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন ওকে নিয়ে উনি । গলার মধ্যে অনামা একটা বোধ দলা পাকিয়ে উঠে নিজের শ্বাসরোধ করে দিলো । লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালেন একটা ।

বললেন, তাই-ই বললেন ডঃ ঘোষ ?

হ্যাঁ ।

এমন সময় হেড লাইট জ্বালিয়ে খুব জোরে-আসা মারুতি গাড়িটা হঠাৎই ওঁদের কাছে পৌঁছে ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়লো । গাড়িটা পথের বাঁ-দিকে পার্ক করিয়ে চিকি নেমে এসে বললো হাই । মামাজী । হাই গিগি ।

তারপর কাছে এসে বললো । ফোন করে দেখা করতে বলেছিলে কেন ? ডঃ ঘোষের কাছে কি গেছিলে ?

হুঁ ।

গিগি বললো ।

গিগিকে ঐ কথাটা আবার উচ্চরণ করার কষ্ট থেকে রেহাই দিয়ে শুভাশিস চাপা গলায় বললেন, ডঃ ঘোষ সাসপেক্ট করছেন যে টুটুর ব্লাড ক্যানসার ...

ও মাই গড ।

বলেই, চিকি গিগির দিকে অসহায়ের মতো তাকালো । পথের আলো এসে ক্রিকেটারের মতো সুন্দর ঋজু চেহারার চিকির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে পড়েছিলো । শুভাশিস বুঝতে পারলেন ওর মুখে চেয়েই গিগিকে খুবই ভালোবাসে ।

চিকি, গিগির বাম গালে ওর ডান হাতের পাতা ছুঁইয়ে বললো । পুওর থিং । ডোন্ট ওয়ারী । আমরা তো আছি । আমি, মামাজী । তুমি, তোমরা তো একা নও । আমরা থাকতে টুটুর কোনোই ক্ষতি হবে না । আমি অনেক কসে জানি যে, ভালো হয়ে গেছে । দরকার হলে, আমার ওকে স্টেটস্ বা ইংল্যান্ডে নিয়ে যাবো । আমার অনেক ওয়েল-অফ্ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বন্ধু-বান্ধব আছে । উই উইল নট লীভ এনি স্টোনস্ আনটার্ন্ড গিগি । এটা তোমার একার প্রবলেম নয়, আমাদেরও ।

সপ্রশংস মুখে ছেলেটির দিকে চাইলেন শুভাশিস ।

বললেন, আমি বলি কি, যাবার আগে একবার নিয়ে যাই টুটুকে ।

ভুণ্ড আর আমার শাশুড়ীকে কি বলবে ? ওরা যে কেউই এই কথা শুনলে সহ্য করতে পারবে না । ওদের নিয়ে অন্য বিপদ হবে ।

ওদের অন্য কথা বলতে হবে । ডঃ মোমাকে দিয়েই অন্য কিছু বলাতে হবে ।

আমিই যাব মেজোমামা তোমার সঙ্গে টুটুকে নিয়ে কোলকাতায়।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

চিকি বলল।

গিগি খুশিতে, আশ্বস্তিতে ঝলমল করে উঠলো। কিন্তু অপরাধের গলায় বলল, তোমার অফিস?

দরকার হলে অফিস থেকে লম্বা ছুটি নেব। সে জন্যে তুমি ভেবো না।

কেন? তুমি কেন আমার ব্যাপারে এতখানি ইনভলভড হবে?

গিগির চোখের কোণে জলের আভাস চিকচিক করে উঠলো বলে মনে হলো শুভাশিসের।

চিকি একবার শুভাশিসের দিকে তাকালো। তারপর সংকোচ কাটিয়ে বললো বীকজ, আই কেয়ার ফর উ। বিকজ ...। তুমি সব কিছুই বোঝো না গিগি। হয়তো অনেকেই বোঝে, কিন্তু সব কিছু বোঝো না।

গিগি চিকির দিকে দুটি জলভরা চোখ তুলে কী যেন বলতে গেলো চিকিকে। বলতে না পেরে, ধরা গলায় বললো মে বী। উ আর রাইট।

শুভাশিস ভাবছিলেন গিগিকে আর চিকিকে দেখে যে, আধুনিকতাটা আসলে এদের পোষাকের অন্যরকম জীবনযাত্রাই। আসলে মানুষ আবহমান কাল ধরে একই রকম আছে। বদলায়নি একটুও। প্রেম, অথবা অপত্য যখন তেমন করে ডাক দেয় তখন মানুষের মধ্যের চিরন্তন রূপটিই বাইরের খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে।

কে জানে, আপত্য, কর্তব্য এসব একজন ভালো মানুষের কাছে নিজেদের আনন্দ, আরাম এমনকি প্রেমের চেয়েও অনেকই গভীরতর বোধ। এই মানুষদের মুক্তি অনেকেই দূরে আষ্টে বাঁধা পড়ে যায় সংসারী মানুষ। তার বন্ধনের স্বরূপটা এমন এমন মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাইরের বে-হিসেবী, উচ্ছল, ক্যুডনট্ -- কেয়ারলেস মনোভাবটা আসলে মিথ্যেই।

॥ ১১ ॥

বম্বে-হাওড়া মেল এসে জব্বলপুর স্টেশনে। প্লাটফর্মে গমগম্ করে উঠলো। ওয়েটিং-রুম ছেড়ে ওঁরা আস্তে আস্তে কম্পার্টমেন্টের দিকে এগোলেন।

ভৃগু আর নলিনী এবং বাটুমাও এসেছিলেন স্টেশনে ওঁদের তুলে দিতে। শ্রাবণীদের পুরোনো কাজের লোক রঘুবীরকে বাড়ি পাহারা দিতে রেখে এসেছে বাটুমাই বন্দোবস্ত করে, টুটুকে সেও বিদায় জানাবে বলে।

ভৃগু এবং নলিনীকে রোগের কথা বলা হয়নি।

জব্বলপুরেও অনেকেই ভালো মিলিটারী হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং ডাক্তারেরা আছেন। কিন্তু ওখানে চিকিৎসা হলে নলিনী বা ভৃগুর কাছে রোগ লুকোনো যেতো না। ডঃ ঘোষ খুব ভাল অভিনেতারই মতো অভিনয় করেছেন। ব্যাপারটা একেবারেই বুঝতে দেননি। উনি কি ভৃগুকে শিশুকাল থেকেই জানেন। ও যে এই সব ব্যাপারে দারুণ নার্ভস, তাও। বিয়ে করতে যাবার সময়ও সঙ্গে কোরামিন দিয়ে দিয়েছিলেন।

ওরা কম্পার্টমেন্টে উঠে গেছেন। ট্রেন ছেড়ে দেবে এক্ষুনি। ভৃগু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টুটুকে আদর করলো। হাসলো, টুটু।

নলিনী লক্ষ্য করলেন হাসিটা আর হাসি নেই। নলিনী ওর গালে হাত দিয়ে আদর করে বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো দাদু।

টুটু বললো, টাটা দিদা।

টাটা! বলতেন গিয়েও থেমে গেল নলিনী। শব্দটাকে গিলে ফেললেন।

গিগি মুখ বাড়িয়ে ভৃগুকে বললো, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না। কাল রাতেই মেজোমামার বাড়ি থেকে তোমাকে ট্রাঙ্ক-কল করবো।

নাঃ। চিন্তার আর কি আছে?

বলেই ভৃগু মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

শুভাশিসের মনে হলো অনেকেই দম্পতি থাকে এই সংসারে যাদের মধ্যে স্বামীরা স্ত্রীর ভূমিকা নেয় এবং স্ত্রীরা স্বামীর ভূমিকা। তাতে যায় আসে না কিছুই। নাটক মঞ্চস্থ হওয়াটাই বড় কথা।

ট্রেন ছেড়ে দিলো।

শুভাশিস জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ভালো থাকবেন বেয়ান।

নলিনী গায়ের শালের ভেতর থেকে ডান হাত তুলে বললেন, আপনিও।

তারপর নিজের ছেলের দিকে একবার অপরাধীর মতো তাকিয়েই বললেন, আবার আসবেন।

আসব।

শুভাশিস বললেন। যদিও জানতেন, যে কথাটা মিথ্যা। এই জীবনে কটি জায়গাতেই, কটি মনেই ফিরে আসা যায়? ইচ্ছে করে খুবই। তবুও, হয় না।

যতক্ষণ না ট্রেনটার টেইল-লাইটের লাল আলো ডিসট্যান্ট সিগন্যালের ওপারে মিলিয়ে গেলো, নলিনী ততক্ষণই চলে-যাওয়া ট্রেনটার দিকে চেয়ে রইলেন। ঐ বাদামী সাপের মতো অপমৃয়মাণ ট্রেনটা তাঁর হৃদয়ের অনেকখানিই ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলো। ক্ষতস্থলে দপদপ্ করছিলো ব্যথায়।

তাঁর সবসময়ের সঙ্গী, তাঁর একাকী জীবনের উপরে চেপে বসে-থাকা সময়ের পাথরকে যে কচি-গলার শিশু তার দুর্বল দুটি হাতে অবলীলায় ঠেলে সরাতো প্রতিদিন। তার একমাত্র সাথী টুটু। এবং ...। এবং হঠাৎ-আসা শুভাশিস!

ভুণ্ড বললো, ধরা গলায়, মা; যাবে না? চলো?

এখনও ট্রেনের লাল আলোটা দেখা যাচ্ছিলো। ছোট্ট বিন্দুর মতো। নলিনী বললেন, যাব। চল্, যাই।

গিগি খাওয়া দাওয়ার পর টুটুর বিছানা করে নিচে বাঙ্কে শুইয়ে দিয়ে নিজে গুছিয়ে বসে বললো, মেজমামা, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। স্লীপিং-স্যুটের বুকটাই তো খোলা। শোওয়ার সময়ে একটা ফুল-স্লিভস্ সোয়েটার পরে নাও বরং। রাতে খুবই ঠাণ্ডা হবে। নেই তোমার? সোয়েটার?

চিকি রিডারস্ ডাইজেস্ট পড়েছিলো। গিগি ফ্লাস্ক খুলে, ওকে গ্লাসে কফি ঢেলে এগিয়ে দিলো। নাইটক্যাপ হিসেবে। হাতে-নাতে ঠেকে গেলো দুজনের।

হঠাৎই গিগির মনে হলো, যেদিন চিকির আদর খেয়েছিলো ও। সেদিনও ওর শরীর এতখানি শিরশির করে ওঠেনি, আজ হাতে হাতে ছোঁয়া লেগে যেমনটি হলো। শরীরটা কিছু নয় মনটাই সব।

শুভাশিস স্যুটকেস খুলে নলিনীর বুনে-দেওয়া ফিকে-হলুদ ফুলী-স্লীভস্ সোয়েটারটা পরে ফেললেন। কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিয়ে। গিগি বড় বড় চোখ করে সোয়েটারের রঙের দিকে চেয়ে রইলো।

শুভাশিস হাসলেন।

বললেন, তোর শাশুড়ী দিয়েছেন।

গিগি হাসলো। এক দারুণ বুঝি, ক্ষমাময় হাসি।

বলল, কেন দেবেন না মেজমামা? তুমিও তো কম দাওনি ওঁকে।

গিগির হাত থেকে কফির পেয়ালা নিয়ে শুভাশিস বললেন, -- কী দিয়েছি?

তুমি কী জানো না।

গিগি একথা অবশ্য বললো, রান্নাঘরের একজস্ট-ফ্যানটার কথা ভেবেই।

শুভাশিস লক্ষ্য করছিলেন যে, চিকি আসলে রিডাসস ডাইজেস্টটা পড়ছে না। এক দৃষ্টে গিগির মুখেরই দিকে চেয়ে আছে।

কেমন লাগছে দাদু? বলোতো রেলগাড়ির চাকারা কি বলছে?

কি?

ক্ষীণকণ্ঠে বললো, টুটু।

তাগাদুম্-তাগাদুম্-তাগা-তাগা-তাগা-দুম্- দুম-দুম -তাগা-তাগা।

তাই না?

তাই?

আবারো ক্ষীণ কণ্ঠে বললো টুটু। চোখ বুঁজে ফেলে।

শুভাশিস টুটুর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। ভাবছিলেন, যে করেই হোক টুটুকে ভালো করে তুলবেনই, কারণ নলিনীর বুকের পাঁজর এই শিশু। উনি গিয়ে পড়েই টুটুকে নলিনীর কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। অভ্যেস, দাম্পত্য, অপত্য এইসব বোধের অনেক প্রাচীন, উর্বর নরম মাটিতে যে সব ফুল ফোটে, ফুটে এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে তাদের হঠাৎ-ঝড়ে আন্দোলিত করা যায়। নিশ্চয়ই। কিন্তু ঝানো যায় না। সংসারের, অভ্যেসের শিকড় বড়

গভীরে যায়। ভালোবাসা, শেষ-বসন্তে মহুয়ার গন্ধরই মতো বড়ই স্বল্পস্থায়ী এক মত্ততা, তাকে প্রলম্বিত করতে চাইলে তা পেজো হেজে যায়। মদ অথবা বমিই হয়ে যায় তা ; মন-উদাস করা সুবাস আর তা থাকে না।

টুটুকে ভালো নিশ্চয়ই করে তুলবেন শুভাশিস। কিন্তু আর যতদিন বাঁচবেন কোনোদিনও জব্বলপুরে আসবেন না। জীবনেও সান্ধ্য-আইন একবার জারি হয়ে গেলে ঘর ছেড়ে না বেরোনোই বোধহয় ভালো। কখন যে কে কাকে কানাগলিতে চ্যালেঞ্জ করে বসে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। দুহাত তুলে আলোমানুখী জানালেও অনেকের বুকে গুলি লাগেও।

চিকি বললো, উী আর আ গ্রেট গাঙ্গ মামাজী !

অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়া শুভাশিস চমকে উঠে বললেন, "হোয়াট মেকস উী থিঙ্ক সো ?"

এই অল্পদিনেই পিপিদের সমস্ত পরিবার, ইনক্লুডিং বাটুমা, আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। রিয়্যালী সমস্ত পরিবারই। এরকম প্রেম দেখা যায় না।

শুভাশিস হাসলেন।

মুখে বললেন, নট দ্যাট আই নো অফ।

পিপি হাসলো ওদের কথা শুনে।

মনে মনে শুভাশিস বললেন, ভালোবাসার ক্ষেত্রে "সমস্ত" "সামগ্রিক" বলে কোনো কথা নেই। ভালোবাসা মানেই ফ্র্যাগমেন্টেড। টুকরো-টাকরা। এই ফিরে-হলুদ নরম উলের সোয়েটারের মধ্যে নলিনীর নরম ভালোবাসার আঙুলের আলতো পরশেরই মতো।

পিপি তার ব্যাগ থেকে বের করে ওর ক্যাসেট-রেকর্ডারটা নিচুগ্রামে চালালো।

বললো, তুমি যখন জঙ্গলে গেছিলে, মা গভীর রাতে অর্গান বাজিয়ে কী দারুণ যে গান গাইতেন। আমি দু'রাতে মাকে বলেই টেপ করে রেখেছিলাম। তুমি তো বাংলা গান ভালোবাসো ! শোনো।

নলিনীর গলা অর্গানের গমগমে আওয়াজের সঙ্গে ভরপুর সুরে বলে উঠলো :

"খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো
বিদায় দাও, গেলো যে খেলার বেলা
ডাকিল পথিকে, দিকে বিদিকে,
ভাঙিল রে সুখমেলা ..."

ঠিক সেই সময়ই ট্রেনটা হঠাৎই একটা নদীর উপরে উঠে এলো। চাকাগুলো চেঁচিয়ে উঠলো : ঘাম-ঘাম-ঘাম-ঘাম -- গিড-গিডি-গিডি-খটা-খটা-খটা-গাম-গাম-গাম -গাম-গাম ...

কামরার আলোগুলো সব নিভিয়ে দিলেন শুভাশিস। টুটু ঘুমিয়ে পড়েছে এখন। চিকিও। উপরের বাঙ্ক থেকে পিপি দেখা যাবে নিচের বাঙ্কে।

শুভাশিস বললেন, পড়েছিস তোরা ? রবীন্দ্রনাথ ? রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি ... গাড়ি ভরা ঘুম কামরা নিঝুম। বলেই, বললেন, নীল আলোটা কি থাকবে রে ? পিপি ?

কী দরকার ? নিভিয়েই দাও। ঘরে আলো জ্বললে ঘুম আসে না আমার।

আলোটা নিভিয়ে দিলেন শুভাশিস। কম্বলটা ভালো করে টেনে নিলেন গায়ে। পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে বললেন, পিপি ও চিকিদের মতো প্রত্যেক নারী ও পুরুষকেই তাদের জীবনেই এমন একটা সময়ে গিয়ে পৌঁছতে হয়, যখন ঘরে আলো না জ্বললেই ঘুম আসে না। সেই সময়টা যত দেরী করে আসে ততই ভালো।